মোহাম্মদ মোদাব্বের

দাম বারো আনা

উৎসর্গ

কুমারী আরতি মুখার্জ্জি ও

হোস্‌নে আরা বেগমকে

দিলাম।

নিবেদন

বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্র সমাজ ও ধন-বিজ্ঞান বিষয়ে যে সমস্ত আন্দোলন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, নারী-আন্দোলন সে-সবের অন্যতম। প্রতীচ্যে নারী তাহার শক্তি প্রকাশ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; বিশেষ করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকায় নারী সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য দেশগুলিতেও নারী-সমাজের মধ্যে অল্পে অল্পে জাগরণ দেখা দিয়াছে। স্থানে স্থানে নারী-চিত্তে আজ বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তুরস্ক, পারস্য ও মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো দেশে নারী আজ পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে।

এই পুস্তকে কেবল আধুনিক মুসলিম নারীদের জাগরণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মুসলিম নারীদের বিদ্রোহ বাঙ্গলার মুসলিম সমাজ কতটা সহ্য করিতে পারিবে, জানি না। তবে, যুগের সঙ্গে যাঁরা সমান তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাঁরা এ বিদ্রোহকে বরণ করিবেন, এ ভরসা আমার আছে। চিন্তাশীল মুসলিম মাত্রই স্বীকার করেন যে, অবরোধ প্রথা সমাজজীবনে এক দুরারোগ্য ব্যাধি। উপরন্তু এ কথাও সকলে বিশ্বাস করেন যে, সকল সমাজেই কঠোর পর্দ্দার যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। সময়ের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে এই পর্দ্দার ব্যাধি পদে পদে যে বাধা সৃষ্টি করিবে, পুরুষ শত চেষ্টা করিলেও নারী অধিক দিন তাহা মানিয়া চলিবে না;

যে সমাজ এই আপাতঃ-কঠোর অথচ নিছক সত্যকে অস্বীকার করিবে তাহার ভবিষ্যৎ যে কল্যাণ প্রসূ নয়, এ কথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য।

ভারতের বিদ্রোহী নারীদের সম্বন্ধে কোন কথা এ পুস্তকে বলা হয় নাই। অন্য দেশের অ-মুসলিম নারীদের সম্বন্ধেও কিছু বলা হয় নাই। কারণ অ-মুসলিম নারীরা মুসলিম নারীদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের প্রগতি আজ জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ভারতীয় মুসলিম নারী সমাজের জাগরণ সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হয় নাই, কারণ, এ সংবাদ জানা কষ্টসাধ্য নহে। ভারতীয় মুসলিম নারীরা যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা কাহারও কাছে অবিদিত নাই। ভূপালের মরহুম বেগম মাতা (নওয়াব সুলতান জাহান বেগম) মিসেস শাহ্ নওয়াজ প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

বাংলার মুসলিম-নারী-শিক্ষার অগ্রদূত, সুলেখিকা মিসেস আর, এস, হোসেন এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

সুলেখিকা শ্রীযুক্তা সীতা দেবীর "পারস্যের নারী" প্রবন্ধের কতক অংশ এই পুস্তকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এজন্য আমি তাঁর নিকট ঋণী। অগ্রজোপম মৌলবী খায়রুল আনাম খাঁর প্রচেষ্টা এই পুস্তকের পরিপূর্ণ রূপ দিয়াছে। ইতি—

মোহাম্মদ মোদাব্বের

হাড়োয়া, ২৪ পরগণা

১৩২২

ভূমিকা

"মুক্তি মন্ত্রে মুসলিম নারী" পুস্তকের ভূমিকা লেখার ভার পড়িয়াছে আমার ন্যায় অবরোধ-বন্দিনীর উপর! এ পুস্তকের সমস্ত লেখাই আমি পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি। এই লেখাগুলি যে আমারই প্রাণের উক্তির প্রতিধ্বনি, তাই ইহা আমার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান নাই যে, সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি "মতিচূরে" ঐ ধরনের কথাই লিখিয়াছিলাম। (মতিচূরের ৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। তখন আমার কথা বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ কাণে তুলেন নাই। কাণে তোলা দূরে থাকুক, কতকগুলি মুসলিম চালিত পত্রিকা ("মিহির" ও "সুধাকর" প্রভৃতি) আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছেন।

মতিচূরের ২৩ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছি—"সে দিন একখানা উর্দ্দু কাগজে দেখিলাম ঃ—

তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা সুলতান সমীপে আবেদন করিয়াছেন, যে চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদের আর কোন কাজ নাই। আমাদিগকে অন্ততঃ এ পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হউক, যাহার সাহায্যে যুদ্ধের সময় আমরা আপন আপন বাটী এবং নগর পুরুষদের মত বন্দুক কামান দ্বারা রক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন ঃ—

(১). প্রধান উপকার এই যে, নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসংখ্যা কম হওয়ায় যে ক্ষতি

হয়, তাহা আর হইবে না। (যেহেতু "অবলা"গণ নগর রক্ষা করিবেন)!

(২) সন্তান-সন্ততিবর্গ শৈশব হইতেই যুদ্ধ বিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতামাতা উভয়ে সিপাহি হইলে শিশুগণ ভীরু কাপুরুষ হইবে না।

(৩) তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দ্দি (Uniform) প্রস্তুত করিবেন যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে। * * *

বলি এ দেশের সমাজপতিগণ, "লেডি কেরাণী" হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন, তাঁহারা ঐ লেডী যোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কি করিবেন? মূর্চ্ছা যাইবেন না ত?"

কালের বিচিত্র গতি—যে তুরস্কনারী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশও অনাবৃত রাখিবার প্রস্তাব করেন নাই, তাঁহারাই ১০।১২ বৎসর পরে (অর্থাৎ ১৯১৬ খৃঃ) সম্পূর্ণ হেরেম প্রথা হইতে মুক্তি লাভ করেন। এখন ত তাঁহারা থিয়াটারে অভিনয় পর্য্যন্ত করেন।

২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি মুসলিম নারীর জন্য যাহা ভিক্ষাস্বরূপ চাহিয়াছিলাম—আজ তাহার চেয়ে অনেক বেশী তাঁহারা আদায় করিতেছেন। আমার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে দেখিয়া আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি।

আমাকে এই অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী পুস্তকের ভূমিকা লেখার ভার দিয়া মোঃ মোহাম্মদ মোদাব্বের সাহেব আমাকে যে সম্মানিত করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বঙ্গে এখন বিদূষী মহিলার অভাব নাই, তবু যে লেখক সাহেব মাদৃশী বিদ্যাবুদ্ধি-হীনাকে এই কাজের ভার দিলেন, ইহা আশ্চর্য্যই বলিতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস "মুক্তি মন্ত্রে মুসলিম নারী" বঙ্গের ঘরে ঘরে আদৃত হইবে। সমাজের গৃহ কোণে যেটুকু তন্দ্রা বা আলস্য আছে, তাহা এই পুস্তক পাঠে সম্পূর্ণ বিদূরীত হইবে।

সাখাওয়াত মিমোরিয়াল গার্লস্ হাইস্কুল
কলিকাতা
১৩২২

বিনীতা
(মিসেস) আর, এস, হোসেন

ইংলণ্ডে তুরস্কের প্রথম মহিলা দূত

বেগম আহম্মদ ফরিদ বে

মুসলিম নারী

তুরস্কে নারী আন্দোলন

নারী আন্দোলন ব্যতীত সমাজ জাগে না। তুরস্কে নারী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার ঘুমন্ত সমাজ জাগিয়াছে। তাহারা সামাজিক জীবনে একটা নূতন ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছে। পুরুষ জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া তাহারা নিজেদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট আসন বাছিয়া লইয়াছে। তুরস্কের সামরিক, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়েই তুর্কী নারীরা নিজেদের স্বার্থ আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে। সম্প্রতি তাহারা মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের ভোটার হইবার জন্য দাবী করিয়াছিল তুরস্কের পুরুষজাতি তাদের এই 'অসঙ্গত' দাবীকে উপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তুর্কী নারীরা তাদের এই দাবী ষোল আনাই আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে।

তুরস্কের নারী-প্রগতি এখন উদ্দাম গতিতে চলিয়াছে। এই সময় যদি আমরা তুরস্কের পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সে যুগে তুর্কী নারীদের স্থান কত নিম্নে ছিল। অধিক পূর্ব্বের ইতিহাস আলোচনা না করিয়া শুধু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার অর্থাৎ খেলাফতী যুগের ইতিহাস যদি আলোচনা করি তাহা হইলেও

সে সময়ের নারী জাহানের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে ; তখনকার নারীদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে ধর্ম্মের ও মোল্লাদের ফৎওয়ার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইত। এই হতভাগিনী নারীরা পুরুষকে আজরাইলের মত ভয় করিত। লজ্জা ত করিতই। ইহার কারণ, তাহারা মনে করিত যে, নারী জাতি পুরুষের পাঁজরার মাত্র একখানি হাড় হইতে সৃষ্টি হইয়াছে ; সেজন্য তাহারা পুরুষের নিকট ঋণী ও পুরুষরা তাহাদের পূজ্য ও সম্মানের পাত্র। পুরুষ জাতির পায়ের নীচে বেহেশ্‌ত। যাহারা পুরুষদিগকে ঘৃণা করে তাহারা এই বেহেশ্‌ত হইতে বঞ্চিত হয়। তখনকার নারীরা মনে করিত নারী হইয়া জন্মলাভ করা খোদার অভিশাপ। নারী বিকি-কিনির জিনিষ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহারা খেলার সামগ্রী ; পুরাতন বা খারাপ হইলে এক পাশে ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। এ দোষ যে শুধু তাদের তাহা নয়। তখনকার সমাজ, আইন, শিক্ষা এবং বিশেষ করিয়া পুরুষ জাতি তাহাদিগকে এইরূপ সামাজিক আবর্জ্জনায় পরিণত করিয়াছিল।

মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বেও তুরস্কের নারী সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাতে তখনকার দিনে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে এ জাতির আর বাঁচিয়া থাকিবার আশা নাই। তখন যদি কোন হতভাগিনী নারী কদাচিৎ তাহার মুখের ঘোমটা একটুও উন্মোচন করিত তাহা হইলে তাহাকে কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। বংশ ও পদমর্য্যাদা বিশেষে ঘোমটারও তারতম্য ছিল। যিনি যত বেশী সম্ভ্রান্ত পরিবার-ভুক্ত হইবেন, তাঁহাকে তত অধিক মোটা ঘোমটা ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাই ছিল তখনকার ধর্ম্ম-গুরুর (শেখ-উল-ইস্‌লামের) নির্দ্দেশ।

সেই পুরাতন যুগের নারীদের অনেকেই এখনও জীবিতা। তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের মুক্ত হাওয়ায় এখনও তাহারা বিচরণ করিতেছে ও স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করিতেছে। তুরস্কের নূতন আইন নারী ও পুরুষের পার্থক্য দূর করিয়া দিয়াছে। নারী ও পুরুষ আজ সকলের নিকট সমান সম্মান লাভ করিতেছে। নারীরা এখন আর খড়কুটা নয় যে ইচ্ছামত দূর করিয়া ফেলিয়া দিবে। এখন তুর্কী নারীরা সামান্য ও হেয় প্রাণী হইতে সমাজের একটী বিরাট দেহে পরিণত হইয়াছে। কলকারখানায় এবং অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের যে কোন কাজে তুর্কী নারীর শক্তি ও অন্তরের প্রেরণা খুবই ব্যাপকভাবে অনুভূত হইতেছে। তুর্কী পুরুষগণ এখন আর তুর্কী নারীগণকে কেবল নারী বলিয়া মনে করে না, সহকর্ম্মী বলিয়াও মনে করে। কারণ তাহারা জানে যে তুর্কী নারীর অধিকার এখন পুরুষের অপেক্ষা কম নহে।

অতীতে, খেলাফতের যুগে, যে সকল নারী প্রহরী বেষ্টিত হইয়া বিদ্যালয়ে যাইত, আজ তাহাদের কন্যা-দৌহিত্রীগণ স্বাধীন ভাবে বিদ্যালাভ করিতেছে। পর্দ্দার প্রাচীর টপকাইয়া তাহারা আজ সাধারণ-তন্ত্রের খোলা ময়দানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তুর্কী নারীরা সাধারণতন্ত্রের আবহাওয়ায় কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছে; জনৈক তুর্কী মহিলার পত্র হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তুরস্কের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল পাশাকে ধন্যবাদ দিয়া "ইক্‌দাম" পত্রে লিখিয়াছেন—"আমি যখন সংবাদপত্রে পড়িলাম যে আমাদের মহানুভব গাজী কামাল পাশা তুর্কী নারীদিগকে সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে আসন দিয়াছেন, তখন যে আমি কত আনন্দ লাভ করিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নারী জাতির

উন্নতি সাধনের জন্য তিনি যেরূপ আগ্রহান্বিত তাহাতে তিনি যে তুর্কীর তথা দুনিয়ার নারী জাতির ধন্যবাদের পাত্র হইবেন তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি।

হে মহান, হে গাজী—তুমি তুরস্কের মহিলাগণকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছ; তাহাদিগের জীবন-সম্মান তুমিই রক্ষা করিয়াছ। অশিক্ষার অন্ধকার হইতে তুমি তাহাদিগকে শিক্ষার আলোকে আনয়ন করিয়াছ এবং তুমিই তাহাদিগকে মনুষ্যত্ব বোধের অনুপ্রেরণা দিয়াছ ও সভ্যতার আলোকে স্নান করাইয়াছ। তোমাকে ধন্যবাদ, খোদা তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন।”

জাতীয় মহাসভায় তুর্কী নারী

আজ যাহা চিন্তা করা যায়, কাল তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। তুর্কী নারীরা স্বাধীনতার সাড়া পাইয়াছিল, তাহার ফলে আজ তাহারা দুনিয়ার নারীদের পক্ষে যাহা সম্ভব তাহার প্রায় সবটুকু অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহাদের এই গতিরোধ করিবার কোন উপায় নাই, কারণ দুনিয়ার সমস্ত সভ্যজাতির নারীদের মধ্যেই এইরূপ জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। তাহাদের ন্যায্য দাবী অস্বীকার করার উপায় পুরুষ জাতির নাই। তুর্কী পুরুষরাও তাই নারীদের সঙ্গে একই তালে গাহিতেছে “এগিয়ে চল্।”

রাজনৈতিক ব্যাপারে নারীদের কোন অধিকার দেওয়ার ঘোর বিপক্ষে ছিল ইংলণ্ড। এককথায় নারীদের বিষয়ে এই দেশ ভীষণ গোঁড়ামী করিত। কিন্তু তাহার ফলে আজ কি হইয়াছে? ইংলণ্ডের নারীরা বজ্রবাঁধনের ছোটা ছিঁড়িয়াছে। আজ বৃটিশ মহাসভা নারী সদস্যে ছাইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক বয়স্থা নারী ভোট দেওয়ার

অধিকার লাভ করিয়াছে। আমেরিকা কিন্তু এই ব্যাপারে উঠিয়াছে সকলের উপরে। এখানকার নারীর ক্ষমতা অন্য সমস্ত দেশের নারীদের চেয়ে অনেক বেশী। কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের যে সভাপতি নির্ব্বাচন হইয়াছিল তাহাতে নারী কর্ত্তৃক সমর্থিত প্রার্থীই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মিঃ হুভার অধিক সংখ্যক নারীর ভোটে আমেরিকা সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্রে নারীর অত্যধিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি সেখানকার কোন একটি প্রদেশ নারী কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

নারী প্রগতির আধুনিক গতিই এইরূপ। এই প্রগতির ঘূর্ণাবর্ত্তে তুর্কী নারীরা না পড়িয়া পারে নাই। তুরস্কে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই তুর্কী নারীরা নিজের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পাইয়াছিল। তাই তাহারা বহুকালের পরাধীনতা ও দীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নিজের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবী করিল। তদানীন্তন শাসন তন্ত্র তাহাদের সে দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই, কিন্তু সে দাবী রক্ষার জন্য কোনরূপ আইন বিধিবদ্ধ করা হয় নাই। যাহা হউক সেই সময়টাই হইল তুর্কী নারী সমাজে জাগরণের প্রথম প্রভাত।

তাহার পর আসিল তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের স্বর্ণযুগ। এই স্বর্ণযুগের ভাগ্য বিধাতারূপে তুরস্কের জনগণের হৃদয় মন্দিরে ও তমসাচ্ছন্ন তুরস্কের রাষ্ট্র ক্ষেত্রে দেখা দিলেন মহামানব গাজী মোস্তাফা কামালপাশা। সমগ্র তুরস্ক সাম্রাজ্য তাঁহার অঙ্গুলী হেলনে আন্দোলিত হইল। দেশের স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্ররূপ বদলাইয়া গেল। শ্রেণী বিশেষের অব্যাহত অধিকারের চাপ হইতে দেশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার পর আসিল

"রিফর্মের" জোয়ার। সে জোয়ারের মুখে পুরাতন কু-সংস্কারের জঞ্জাল ভাসিয়া গেল; অন্যায় ও অত্যাচারের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িল।

এই সময় মহাপ্রাণ কামালপাশা তুরস্কের শিক্ষা-সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী মহিলাদের দুরবস্থার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দুনিয়ার মানব জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ নারী জাতি; তাহারা অশিক্ষার আঁধারে ডুবিয়া থাকিবে—ইহা একেবারে অসহ্য। পুরুষদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নারীদের শিক্ষা সংস্কারে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করিলে কতিপয় পুরাতন ভাবাপন্ন তুর্কী রাজপুরুষ বলিয়াছিলেন যে ইহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই ফলিবে বেশী। উত্তরে কামালপাশা বলিয়াছেন—"বিশ্ব যখন সকল বিষয়ে এগিয়ে চলেছে, শিক্ষায় দীক্ষায় সভ্যতায় যখন কেহই পশ্চাদপদ নহে তখনও কি তুরস্ক ঘুমাইয়া রহিবে? তুরস্কের নারীশক্তিকে দাবাইয়া রাখিয়া দেশকে কি এখনও সভ্যজগতের বাহিরে রাখিতে হইবে?" তিনি দেশের পুরাতন পাণ্ডাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজেই নারী স্বাধীনতার জন্য কার্য্য করিতে লাগিলেন। অবশ্য তিনি এ বিষয়ে তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিনী লতিফা হানুম ও তুর্কিজননী হালিদা হানুমের যথেষ্ঠ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

নারী সমাজের মধ্যে উন্নতির আন্দোলন চালাইতে হইলে ইহা এমনভাবে চালাইতে হইবে যে তাহাতে তুর্কী নারীগণ যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। সেইজন্য তিনি প্রথম হইতে শিক্ষিতা নারীগণকে কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতিতে প্রবেশের অধিকার দেন। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে নারীর যে অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল, রিপাব্লিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কামালপাশা নারীর এই

অধিকারকে মুখের কথায় মানিয়া লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি এই অধিকারকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাই আজ সমগ্র তুরস্ক সাম্রাজ্যে নারীর অধিকার পুরুষের সহিত সমান ভাবে রক্ষিত হইতেছে। তুরস্কের আফিসে, কারখানায়, আদালতে—সমস্ত কার্য্যে পুরুষের সহিত নারীরা প্রতিযোগিতা করিতেছে।

কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি

নারী আন্দোলনের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে হইলে এই উদ্দেশ্যে দেশে শক্তিশালী সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক। এই জন্য তুরস্কে অনেকগুলি মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা আঙ্গোরার কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতির কার্য্যাবলীর অনুসরণ করে। কেন্দ্রীয় সমিতির উদ্দেশ্যা- বলী তুর্কী মহিলাদের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির অনুকুল। নারী জাতির সকল প্রকার অভাব অভিযোগ দাবী দাওয়া পূরণ করিতে এই সমিতি আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই সমিতি তাহাদের কার্য্যক্রম নিম্নলিখিতরূপ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে এবং এই বিভাগগুলির প্রত্যেকটীর জন্য একজন করিয়া কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে।

১। শিক্ষা বিভাগ।—

এই বিভাগের উদ্দেশ্য (ক) সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ, (খ) সাধারণ পাঠাগার খোলা (গ) নারীগণকে আধুনিক সভ্যতা বিষয়ে শিক্ষা দান (ঘ) সমিতির উদ্দেশ্যাবলী সাধারণকে বুঝাইবার জন্য মাসিক বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা (ঙ) বৈদেশিক নারী সমিতিগুলির সহিত মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন।

২। সামাজিক বিভাগ।—

এই বিভাগের উদ্দেশ্য—(ক) সমস্ত নারী সদস্যের জন্য মাসিক সভা

আহ্বান (খ) নূতন সদস্য গ্রহণ করা (গ) বৎসরে দুইবার প্রীতি সম্মিলন করা (ঘ) দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও রক্ষার জন্য প্রদর্শনী খোলা।

৩। আইন বিভাগ।—

ইহার উদ্দেশ্য, আইন কানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা ও কাউন্সিল ইলেকশন সম্বন্ধে সকল বিষয় অবগত হওয়া।

৪। সাহায্য বিভাগ।—

এই বিভাগের উদ্দেশ্য, যাহারা দুস্থ তাহাদিগকে (ক) আর্থিক সাহায্য (খ) শারীরিক সাহায্য করা ও (গ) দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা।

এই সমিতির প্রাথমিক কার্য্যাবলীর হিসাব দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা অল্প কালের মধ্যে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। সাধারণ পাঠাগার খোলা হইয়াছে এবং প্রত্যেক সদস্য ও পাঠক এই পাঠাগারে কতকগুলি করিয়া পুস্তক দান করিয়াছে। এই পাঠাগারে যে কেবল তুরস্ক ভাষায় লিখিত পুস্তক স্থান পাইয়াছে তাহা নহে, ফরাসী ইংরাজী ও ল্যাটিন পুস্তকও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই পাঠাগার হইতে অনেক তুর্কী নারী ও বালিকা খুবই উপকার পাইতেছে। বৈদেশিক পুস্তকগুলি দ্বারা তাহারা কুটীর শিল্পের উন্নতি বিষয়ক অনেক নূতন শিক্ষা লাভ করিতেছে।

এই সমিতি আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সঙ্ঘের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক পাতাইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সঙ্ঘ এই সমিতি হইতে কতকগুলি ডেলিগেট গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আইনজীবি। এই সমিতি বর্ত্তমানে একটী অনুসন্ধান কমিটী গঠন করিয়াছে, উদ্দেশ্য, বিশ্বসভায় তুরস্কের স্থান কোথায় তাহা অনুসন্ধান করা এবং নিম্নলিখিত

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল মজিদের বিদুষী কন্যাদ্বয়

শাহজাদী নীলুফার

শাহজাদী দোরবে শাহার

কিছুদিন পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের দুই পুত্রের সহিত ইঁহাদের বিবাহ হইয়াছে।

বিষয়গুলি সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিয়া দেখা ঃ— (১) অকাল মাতৃত্ব (২) বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘ ও শান্তির অবস্থা (৩) বিবাহিতা নারীদের অবস্থা (৪) বালিকাদিগের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নারী পুলিস রাখা ও আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করা (৫) তুর্কী নারীদিগের বেশ্যা বৃত্তি নিরোধ করা (৬) কার্য্যক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার (৭) আইনের চক্ষে নারী পুরুষের সমান ব্যবস্থা (৮) দরিদ্র বালক বালিকা-গণকে রাজকীয় সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা।

দুস্থের সেবা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তুরস্কের কেন্দ্রীয় নারী সমিতি নারী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কার্য্য করিতেছে। তবে কেবল নারীদের জন্যই এই সমিতি যে চিন্তা করে তাহা নহে, দুস্থের সেবা ও ইহার আরেকটী ধর্ম্ম। সমিতির আয়ের অধিকাংশ দরিদ্র বালক বালিকাগণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে দরিদ্র রোগীগণকে যত্নের সহিত ঔষধাদি দেওয়া। চিকিৎসালয়ের একটী বিশেষত্ব এই যে এখানে পুরুষ চিকিৎসকের স্থান নাই, সমস্ত কার্য্যই নারী চিকিৎসক ও নারী কম্পাউণ্ডারের দ্বারাই সাধিত হয়।

দিনের পর দিন এই সমিতির সদস্য-সংখ্যা যেরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং চারিদিক হইতে যেরূপ সাহায্য পাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে তুরস্কে সত্বর এমন দিন আসিবে যখন কর্ম্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের কর্ম্মশক্তির পার্থক্য অনুভূত হইবে না।

তুর্কী নারীদের জীবন যাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে "মিল্লিয়াত" পত্র যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

তুরস্কে নারী কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে

নারীর সংখ্যা যেরূপ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় তুরস্কের কর্ম্মক্ষেত্র নারীর দ্বারা ছাইয়া পড়িবে। আফিস ও কারখানা প্রভৃতিতে নারীরা খুবই কৃতকার্য্যতার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছে। পুরুষদের সহিত নারীরাও কাজ করিতে পারিতেছে বলিয়া তুরস্কের সাধারণ অর্থ নৈতিক জীবনে একটা পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া তুর্কী নারীরা শিশুপালন ও রান্নাঘরের কাজ ছাড়াও যে একটা নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছে, একটা নূতন জীবনের সাড়া পাইয়াছে, এজন্য মনে হয় যে তাহারা খুবই সুখী।

তুর্কী যুবতীদের চাকুরীর প্রধান ক্ষেত্র ডাকঘর। ডাকঘরের সামান্য কেরাণী ও পিওন হইতে দায়িত্বপূর্ণ পোষ্ট মাষ্টারের পদে অনেক তুর্কী যুবতী কাজ করিতেছে। গত মহাসমরের সময় যে সকল তুর্কী মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা ও স্বেচ্ছাসৈনিকের কাজ করিয়াছে, তাহারা সরকারী চাকুরীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। তুর্কী নারী টাইপিষ্টের সংখ্যাও আশ্চর্য্যরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। যে তুর্কী নারীরা কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বাহিরের মুক্ত বাতাস ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করা ত দূরের কথা, তাহার কল্পনাও করিতে পারিত না, আজ তাহাদের হাজার হাজার বালিকা ও যুবতী ব্যবসায়ী-শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে—তাহাদের অসংখ্য নারী ও বালিকা আজ কমার্শিয়াল স্কুলে টাইপিষ্টের কাজ শিখিতেছে। তুরস্কের সদর সরকারী আপিসে বর্ত্তমানে প্রায় ২০০ নারী কেরাণী ও টাইপিষ্ট এবং ট্রামওয়ে, টেলিফোন ও অন্যান্য আপিসে পাঁচ শতেরও অধিক নারী কর্ম্মচারী কাজ করিতেছে। কেবল চাকুরী ছাড়াও তুর্কী নারীরা ব্যবহারিক জীবনে তুর্কী পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে সাফল্যও তাহারা কম অর্জ্জন করিতেছে না। তুরস্কের সিগারেট ও তামাকের কারখানা-

গুলি প্রায় ১০ হাজার বিশেষজ্ঞ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই কারখানাগুলির সামান্য কুলি মজুর হইতে দায়িত্বপূর্ণ পরিচালকের কাজ নারীর দ্বারা সম্পন্ন হয়।

তুরস্কের খাল্ক্ পার্টি নামক একটী বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিক্ষা সমাপ্তি হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানেই চাকুরী দেওয়া হয়। এক কথায় ঐখানে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে পুরুষের দুর্ভাগ্য যে সেখানে তাহারা বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। শত শত তুর্কী নারী পুরুষদের প্রবেশ পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আদালতে নারী কর্ম্মচারীর সংখ্যাও কম নহে। উকিল, মুহুরী প্রভৃতির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে তুর্কী নারীদের অগ্রগতি দেখিয়া বৈদেশিক ব্যবসায়ীগণ তাহাদের কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে তুর্কী নারীদিগকে কর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করিতেছে।

সংখ্যায় কম হইলেও তুরস্কের নারী সাংবাদিক, চিকিৎসক ও ব্যবহারাজীবের অভাব নাই।

ইরান লীগের "বুলেটিন" হইতে তুর্কী নারীদের সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে তুর্কী মেয়েরা তাদের দেশটাকে যেন ভাঙ্গিয়া গড়িতে চায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়ার আর কোন দেশ নারীদের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছিল ব'লিয়া জানা যায় নাই। সমস্ত তুরস্কটা যেন তুর্কী মেয়েদের মনের মত করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। তুর্কী নারীদের সম্বন্ধে "ইরান লীগ"-সদস্য মিঃ এ, সিরি বে বলিতেছেন ঃ—মাত্র কয়েক বৎসর হইল এ দেশের নারীরা কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছে। গৃহকর্ত্রী নারী ও কারখানার কর্ম্মচারী

নারীদের ছাড়াও এদেশে আর এক শ্রেণীর নারীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, যারা সারা দেশটাকে একটা নূতনের পথে পরিচালিত করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহারাই নারী মুক্তির অগ্রদূত। তুরস্কের বিদ্যালয়, ল্যাবরেটরী ও সরকারী আপিস সমূহে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে তথাকার নারীরা কিরূপে তাহাদের কর্ম্মশক্তির স্ফুরণ করিতেছে। তুর্কী নারী কর্ম্মচারীদের প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তাদের ব্যবহার দেখিলে বুঝা যায় যে তাহাদের গতি কোন দিকে ধাবিত হইয়াছে। তুরস্কের মহাজনগণ নারীদের কার্য্যে এত সন্তুষ্ট হয় যে তাহারা তাহাদের আফিস সমূহে নারীদের বিশেষ অধিকার দান করে। নারীদের পুরুষ সহকর্ম্মীরা যে এই জন্য তাহাদের প্রতি কোনরূপ হিংসার ভাব পোষণ করে, তাহা নয়। বরং তাহারা এ জন্য বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে। কারণ আধুনিক তুর্কী পুরুষরাও চায় না যে তাহাদের মাতা, ভগিনী ও কন্যারা তাহাদের কাঁধের অনাবশ্যক বোঝা হইয়া থাকে। তাহারা চায় যে নারীরাও পুরুষের সহিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংসারিক সুখ দুঃখে সমান অংশ গ্রহণ করুক। আর তাহাদের নরনারীর এই মনোভাবই আজ তুরস্ককে সিদ্ধির পথে তুলিয়া দিয়াছে।

মিঃ এ, সিরি বের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে মাদাম নকীয়া হাসুম তুরস্কের শহর ও পল্লী-নারীদের জীবন যাত্রার ধারা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সকল দেশের নারীদেরই তাহা অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :—

তুরস্কের শহরবাসিনীগণের পক্ষে অর্থনৈতিক চিন্তা একটা নূতন বিষয় বটে, কিন্তু পল্লীবাসিনীগণ অর্থোপার্জ্জনের কাজে অনেক পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্থা আছে। আনাতোলিয়ার নারীরা তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে

কাজ করে, গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের হাটে গিয়া জিনিষপত্র বিক্রয় করে ; তাহারা যে কেবল আন্দোলনে বা সখে মাতিয়া এ রকম কাজ করে, তাহা নয়। নিজেদের সংসারের অভাব মোচনের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া খাটিতে হয়। তুরস্কের পল্লী-সংসারে পুরুষরা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে ভদ্রভাবে সংসার চালান যায় না, কাজেই নারীদিগকে তাহাদের জীবনসঙ্গিনী ছাড়াও কর্ম্মসঙ্গিনী করিয়া লইতে হয়। পল্লীর বিবাহিতা তরুণীকেও অনেক সময় কাজ করিয়া সংসার চালাইতে হয়। মোটের উপর তুরস্কের নারীরা জীবনযাত্রার জন্য যে কোন প্রকার সদুপায়ে উপার্জ্জন করিতে অভ্যস্থা হইয়াছে।

নারীদিগের রাজনীতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে মাদাম নকীয়া হান্ুম বলেন, "তুর্কী নারীদের কার্য্য ক্ষমতা সম্বন্ধে ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে নারী যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে ইহা নিশ্চিত—এবং সে দিন নিকটবর্ত্তী। রিপাব্লিকান গবর্ণমেণ্ট তুর্কী-নারীদের অনেকটা অধিকার দান করিয়াছে, তবে সে দান আধুনিক নারীদের জন্য যথেষ্ট নহে। তবে ইহা নিশ্চিত যে সরকার শীঘ্রই ইহাদের অতি ক্ষুদ্র অভাবটীও পূরণ করিতে বাধ্য হইবে।

"তুর্কী মেয়েরা পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে বলিয়া ইহা যেন মনে না করা হয় যে কেবল তাহারা উপার্জ্জনের জন্যই শ্রম করিয়া থাকে। শ্রম করাটা এখন তুরস্কের সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত বিশিষ্ট আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে বলিলেও চলে। তাহারা মনে করে যে, শ্রম-বিমুখ নারীরা দুনিয়ার আবর্জ্জনা স্বরূপ। ধর্ম্মের দিক দিয়াও একথা বলা হইয়াছে যে কুড়েমির মত পাপ দুনিয়ায় খুব কমই আছে। নারীদিগের মধ্যে কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতে

উচিত নয়। তুর্কী মেয়েরা মনে করে এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করে যে তুরস্কের সুদূর পল্লী-প্রান্তের একটী ক্ষুদ্র কুটীরেও যতক্ষণ জাগরণের সাড়া না পৌঁছিবে ততক্ষণ তুরস্কের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে না। আলস্য ব্যাধি যতদিন তুর্কী মেয়েদের ভিতর হইতে দূরীভূত না হইবে ততদিন তুর্কী মেয়েরা দুনিয়ার স্বাধীনতা প্রয়াসী নারী-জাহানের সহিত নিজদিগকে সমান তালে চালাইতে পারিবে না। আলস্যের কুফল ও জাগরণের সুফল যুগপৎ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াই আজ তাহাদের উন্নতির এই জীবন মরণ পণ।"

নয়া তুর্কীর নারীদের সম্বন্ধে মিঃ লুৎফি বের সহধর্ম্মিনী মাদাম গাযিদে হাসুম যাহা বলিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মাদাম গাযিদে হাসুম একজন খুব উচ্চ শিক্ষিতা তুর্কী মহিলা। তুরস্কের বিখ্যাত দর্ষি বিজ্ঞান কলেজের তিনি প্রিন্সিপ্যাল ও স্বত্বাধিকারিনী। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"আধুনিক যুগ তুরস্কের সক্ষম নারীদের শুধু বসিয়া থাকার যুগ নহে। প্রত্যেক নারীকে কাজ করিতে হয়। যাহার পক্ষে যেরূপ সম্ভব তাহাকে তাহাই করিতে হইবে। নয়া যুগের তুর্কী মেয়েরা জানিতে পারিয়াছে যে অলসতায় আর যত হউক বা না হউক আত্মসম্মান জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহাদের মনে এই প্রেরণা ও আত্মসম্মান জ্ঞান জাগিয়াছে যে, নারী কেবল মাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু নহে; দুনিয়ায় ইহাদের জন্য পুরুষদের মতই একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

"শিক্ষাক্ষেত্রে তুর্কী বালিকাদের অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ। তাহাদের মধ্যে অধ্যবসায়ের বীজ বপন করিয়াছিলেন তুর্কী জননী হালিদা হাসুম। তাঁহারই প্রচেষ্টায় তুর্কীনারীরা শিক্ষায় এতটা

উন্নতি লাভ করিয়াছে। এবং বিশেষ করিয়া তুর্কী নারীদের নব জাগরণ মাদাম হালিদা হানুমের প্রচেষ্টারই স্বর্ণফল।"

শিক্ষিতা হইয়া তুর্কী-নারীরা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের দুইটী পথ বাছিয়া লইয়াছে। শেলজুক হাই স্কুলের প্রধানা কর্ম্মকর্ত্রী সেনিহা নেফিষ হানুম বলেন, "তুর্কী মেয়েদের কর্ম্মধারাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের এক শ্রেণী গৃহিনী ও অন্য শ্রেণী চাকুরী-জীবি এবং চিন্তাশীল। গৃহিনীদের প্রধান কর্ত্তব্য হইল সংসারধর্ম্ম সুচারুরূপে পালন করা, সন্তান পালন করা ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্বামীর সহিত আন্তরিকভাবে কাজ করা। পক্ষান্তরে চিন্তাশীল তুর্কী মহিলারা সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন ছাড়াও জাতি, দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য কাজ করিয়া থাকেন।" তিনি বলেন, আমি আশা করি যে প্রত্যেক চিন্তাশীল তুর্কী মহিলা তাহার স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিনী ও সহকর্ম্মিনী হইবে, প্রত্যেক তুর্কী মহিলা তাহার সন্তানের যোগ্য ও অভিজ্ঞ জননী হইবার দাবী করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত তাহারা বিশ্বাসী অধিবাসিনী হিসাবে দেশের জন্য ও নারীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য আত্মদানে সমর্থ হইবে।

কনষ্টান্টিনোপলের আমেরিকান গার্লস্ কলেজের গ্রাজুয়েট ছাত্রী মালেকা হানুম সম্প্রতি আমেরিকান ওয়ার্কিং হাউসের কর্ম্মকর্ত্রীরূপে কার্য্য করিতেছেন। এই ওয়ার্কিং হাউসের উদ্দেশ্য, অল্প বয়স্কা তুর্কী বালিকাগণকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহারা কর্ম্ম জীবনে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে। এই দিকে তুর্কী মেয়েরা যে কিরূপ ভাবে শিক্ষালাভ করিতেছে ও কিরূপ ভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন :—"এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে আমি আশ্চর্য্যান্বিত

হইয়াছি। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে কার্য্য করিবার ইচ্ছাই আমাদের মনকে নূতনের পথে পরিচালিত করিয়াছে। আমাদের কর্ম্মস্পৃহাই আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভাবিবার অবসর এবং অন্যকে ভালরূপে জানিবার সুবিধা দান করিয়াছে। আজকালকার তুর্কী মেয়েদের কর্ম্মধারার দিকে একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলে আমি দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক তুর্কী মহিলা ও বালিকা তাহাদের বাধা বন্ধনে বজ্র হানিয়া অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধা অগ্রসর হইতেছে, যুবতীকে সম্মুখে রাখিয়া, আর বালিকা ও যুবতী অগ্রসর হইতেছে অক্ষমের হাত ধরিয়া! ফলতঃ এ যুগে কোন তুর্কী মেয়েরাই বসিয়া নাই। সকলেই হাঁকিতেছে "ভাঙ্ আগল" সকলেই বলিতেছে—"এগিয়ে চল।" তাদের কর্ম্ম প্রেরণা দেখিয়া মনে হইতেছে যে ভবিষ্যতে বুঝি এদের প্রত্যেকেই এক একটী হালিদা ও লতিফা হানুম হয়!"

জোহরা মুফিত হানুম নাম্নী জনৈক তুর্কী মহিলা বলিয়াছেন ঃ—"আমি আমার কর্ম্মজীবনকে খুবই পসন্দ করি। দুনিয়ার মধ্যে সত্যই যদি কোন আনন্দের জিনিষ থাকে তাহা হইলে আমার বোধ হয় সেটা কাজ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সুখের বিষয় অধুনা তুর্কী নারীরা ঘোমটার বালাই ছাড়িয়া কাজের পথে নামিয়াছে। এটা সাম্যের যুগ; তুর্কী নারীরাও যে একে একে পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্য কাজে নামিয়াছে, ইহাতে আমি যে কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা অন্যকে বুঝান যায় না! যাহা হউক, আমাদের দাবী আদায় করিতে গিয়া যেন বেচারা পুরুষদের সহিত দ্বন্দ্বে রত না হই! সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে পুরুষদের কাঁধে ভর করিলে চলিবে না; তবে পুরুষের সাহায্যের আবশ্যকতা আছে।"

তুরস্কের প্রথম মহিলা জজ

কুমারী মেসাবাহাত্তিন

তুরস্কের বিখ্যাত নারী ব্যবহারাজীব গাযিদে হান্নুম তুরস্কের একটি সভায় বক্তৃতাকালে ও সংবাদপত্র মারফতে বলিয়াছেন :—"কোনো জাতির উন্নতি করিতে হইলে সেই জাতির প্রত্যেককে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। অবশ্য সেই জাতির প্রত্যেক মানুষের কর্ম্ম-পন্থা এক হওয়া আবশ্যক। আর কর্ম্ম-প্রচেষ্টা পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না; কারণ দুনিয়ায় পুরুষ মানুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেশী। মানুষ জাতির এত বড় অঙ্গকে বাদ দিয়া কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করা যায় না। নারীরাও যে পুরুষের কাছে চোখ রাঙানি না খাইয়া আলস্য ত্যাগ করিবে না, এ কথাও ভাল নয়। পুরুষ ও নারীকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে হইবে। ছোট মেয়েকে কাজ করিতে হইবে, যুবতী নারীকে কাজ করিতে হইবে এবং অশীতিপর বৃদ্ধাকেও কাজ করিতে হইবে। ফলতঃ কাজই যেন নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয়। কাজের মধ্য দিয়াই নারীরা তাহাদের ইপ্সিত ফল লাভে সমর্থা হইবে।" তিনি আরও বলেন যে "বিবাহের পর যদি সম্ভবপর হয় এবং আবশ্যক হয় তবে যে সকল যুবতী চাকুরী করেন তাঁহাদিগকে চাকুরী ছাড়িতে হইবে। গৃহের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে গৃহিনীকে নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না। তবে বাহিরের সমস্ত সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতে আমি বলি না। ঘরে বসিয়াও অনেক নারী জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনা করিতে পারেন।"

ইউরোপের অন্যান্য দেশের অপেক্ষা তুরস্কের নারীরা অনেকটা বেশী স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে "সিভিল কোড" অনুসারে ফ্রান্সের নারীদের চেয়ে তুরস্কের নারীরা বেশী স্বাধীন। অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরা সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃ

ইংলণ্ডের নারীদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে ; তবে তুর্কী মেয়েরা যে আর বেশী দিন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। তারা রাজনীতিক্ষেত্রে পুরুষের মতই সমান অধিকার চায়। কিন্তু চাহিলেই পাওয়া যায় না ; পাওয়ার মত যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। এই যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য তুর্কী মেয়েদের শিক্ষার আরও উন্নতি করা চাই।

ইতিমধ্যে তুর্কী নারীরা তুর্কী সাধারণতন্ত্রের নিকট হইতে অনেকটা অধিকার আদায় করিয়াছে এবং অনেক তুর্কী মহিলা রিপাব্‌লিকান গবর্ণমেণ্টের অধীনে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।”

তুরস্কের জানানা হাসপাতালের ডাক্তার মিস্ সুয়াত রসিম হানুম বলেন, যাহাদের জীবন যাত্রার ভার অন্যের উপর ন্যস্ত থাকে তাহাদের মত দুর্ভাগা জীব দুনিয়ায় আর নাই। হয়ত এই দুর্ভাগ্যের স্বরূপ তুর্কী নারীরা বুঝিয়াছে, তাই কাজের জন্য তাহাদের মধ্যে এরূপ প্রেরণা জাগিয়াছে। আমি আশা করি যে তুর্কী নারীরা অচিরে তাহাদের মধ্যে এমন এক উন্নতির যুগের বান ডাকাইবে যাহার ফলে তাহাদিগকে আর পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

তিনি আরও বলেন যে, “তুর্কী নারীদের ভবিষ্যৎ উজ্জল। তাহারা যেরূপে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আমি খুবই আশা করিতে পারি যে কয়েক যুগ পূর্ব্বে এখানকারই যে নারী-জাতিকে গৃহপালিত জীব বিশেষ করিয়া রাখা হইত, দুনিয়ার প্রত্যাখ্যাত উৎপীড়িত নারী জাতিরই সেই এক অংশ ভবিষ্যতে তুরস্কের রাষ্ট্রজীবনে হয়ত একটা নূতন কর্ম্ম ধারার সূচনা করিবে।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে থিয়েটারের অভিনেত্রী হিসাবে নারীরা যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তুরস্কের নারীরা অভিনেত্রী হিসাবে ততটা

খ্যাতিলাভ করিতে এখনও সক্ষম হয় নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে এদিক দিয়াও তাহারা অদূর-ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করিবে। রাফেত সুরাইয়া হাসুম নাম্নী জনৈক তুর্কী মহিলা বার্লিন ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট ও দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রী। তিনি তাঁহার ছাত্র-জীবনেই অভিনয়ের দিক দিয়া অনেকটা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং এখনও তিনি তুরস্কে অভিনয় শিল্পের উন্নতির জন্য যেরূপ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই তিনি দুনিয়ার অভিনেত্রীবৃন্দের মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবেন।

মোটের উপর যে-রকমটী করিলে একটী জাতি দুনিয়ায় নিজেদের বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারে, তুর্কী জাতি তাহার সব-কিছুই করিতেছে। বিশেষ করিয়া তুরস্কের নারী আন্দোলন এই দেশের উন্নতির পথ অধিকতর সুগম করিয়া দিয়াছে। দুনিয়া আজ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছে যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন দেশ যতই পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক না কেন, সে দেশের নারীশক্তি যদি একবার জাগিয়া উঠে, তবে তাহার অগ্রগমনে বাধা দিবার মত ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তিরই থাকে না।

দুনিয়ার সকল জাতিই আজ বিশ্বাস করে যে তুর্কী নারীরা যে পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে সে পথে বাধার চেয়ে সিদ্ধিই বেশী, বিফলতার চেয়ে সাফল্যের সম্ভাবনাই ষোল আনা।

নারী-স্বাধীনতা-বিরোধীগণ ব্যতীত আর সকলে ইহাও স্বীকার করিবেন যে তুরস্কে যদি একটা নূতনতম যুগের প্রবর্ত্তন হয়, তাহা নারীদিগের দ্বারাই হইবে। তুর্কী নারীরা তুরস্কের উন্নতির স্বর্ণ-দ্বার উন্মুক্ত করিবে। ..

তুর্কী জননী হালিদা এদিব হানুম

নারী জাতির সাহচর্য্য ব্যতিরেকে কোন জাতিই যে বিশ্বের দরবারে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না—উন্নতির সু-উচ্চ শিখরে উঠিতে সক্ষম হয় না, নব্য-তুর্কীর জননী হালিদা এদিব হানুমের কর্ম্মশক্তি দুনিয়ার সামনে তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আজ দুনিয়ার পুরুষজাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে, দুনিয়ার যে কোন শ্রেষ্ঠ কাজ, যাহার উপর জাতির জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে, সে কাজের সাফল্য শুধু পুরুষ জাতির কর্ম্মধারার উপর নির্ভর করে না এবং শুধু পুরুষ জাতির দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয় না, নারী জাতির কর্ম্মশক্তি ও সহায়তার উপর সে সকলের সাফল্য পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। কি জাতিয়তার অনুভূতি, কি সামাজিক সংস্কার, কি আর্ত্তের সেবা, সকল বিষয়েই যে পুরুষদের চেয়ে নারীরা শ্রেষ্ঠ, তাহা বোধ হয় তুর্কী জননী হালিদা হানুমই সর্ব্বপ্রথমে পুরুষজাতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

পরাধীন ও স্বেচ্ছাচারী তুরস্ক গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার নিমিত্তই বোধ হয় খোদা তাঁহাকে প্রথম হইতেই এ কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি তথাকথিত হেরেমের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত দেশবিদেশে শিক্ষার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। নিজেকে ফরাসী, সোভিয়েট প্রভৃতি সুসভ্য পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজী বিদ্যায় তিনি যশস্বিনী হইয়াছিলেন; ফলতঃ বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার মাঝে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে মানুষের যে রকমটী

হওয়া দরকার, তিনি নিজেকে ঠিক তেমনটী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

নিজেকে পাশ্চাত্য প্রথায় গড়িয়া তুলিতে প্রথমে অবশ্য তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। হেরেমের আঁধার প্রাচীরের বাহির হওয়া যে কতবড় দোষণীয় তাহা স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধীরা প্রথমে তাঁহাকে বুঝাইতে কম করে নাই; কিন্তু হালিদা হানুম তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিজে শিক্ষিতা না হইলে তুরস্কের মুক্তি-রণে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে—তুরস্কের নারী জাতিকে হেরেমের আঁধার প্রাচীরের বাহিরে—আলোকে আনিতে না পারিলে—তাহাদিগকে মুক্তি সংগ্রামের উপযোগী করিয়া গড়িতে না পারিলে, তুরস্কের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, স্বেচ্ছাচার ও অজ্ঞান অন্ধকার তুরস্কে চিরদিনের জন্য বিরাজ করিবে।

তাই তিনি যখন ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধানে চলিলেন, তখন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার দিকে বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন যে হালিদা হানুম শুধু তুর্কী বধূ থাকিতে চাহেন না, বরং তিনি তুরস্কের জননী হইতে চান, তখন শ্রদ্ধায় তাঁহাদের মস্তক নত হইয়া পড়িল। বিশ্বের জ্ঞানীমণ্ডলী এই মেয়েটীর তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত না হইয়া পারিলেন না। দুনিয়ায় তিনি তুরস্কের জোয়ান্-অব্-আর্ক বলিয়া পরিচিতা হইলেন। তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহাকে তুরস্কের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, লেডী ম্যাষ্টর প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করিয়া ছিল। শুধু শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিরস্ত হন নাই। নারীর পক্ষে এতকাল যাহা অসম্ভব বলিয়া লোকে মনে করিত, পার্লামেণ্টের সেই সদস্য পদ গ্রহণ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে জগতের

মধ্যে নারীর আদর্শ রাখিয়া দিয়াছেন। তুরস্কের নবীন জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী মহাবীর মোস্তফা কামাল পাশা যখন তুরস্কের স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন, এই মহিয়সী মহিলা তখন কামালের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ইঁহার সাহায্য না পাইলে কামাল পাশা তুর্কীকে নূতন জীবন দান করিতে কখনও সক্ষম হইতেন না। হালিদা হানুম যদি তুর্কী সৈন্যগঠনে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করিতেন, হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণপণ না করিতেন, তাহা হইলে দুনিয়ার সামনে নবীন তুরস্কের প্রভাব বোধহয় ফুটিয়া উঠিত না। তুর্কীরা যে আঁধার সেই আঁধারে থাকিয়া যাইত।

বলকান যুদ্ধের সময় হালিদা হানুম যখন দেখিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ না করিলে তুরস্কের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—তখন তিনি তুরস্কের প্রতি পল্লী প্রান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্য-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন—দেশের দারুণ দুর্দ্দিনের কথা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সকল যুবক ও প্রৌঢ়কে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে তুরস্কের শত্রুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অল্পকাল মধ্যে তুরস্কের নিভৃত পল্লী সমূহের মধ্য হইতে অলস ও বিলাসী তুর্কীগণকে লইয়া তিনি এক বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া ফেলিলেন। এমন কি তিনি দেশের যুবতীগণকে লইয়া একদল নারী সৈন্যও গঠন করিলেন। তুরস্কের বীর সন্তানগণ তাঁহার এই অসামান্য কর্ম্মপটুতায় চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তাঁহারা নতশিরে এই মহিয়সীর নিকটে নিজেদের পরাভব স্বীকার করিলেন—তুরস্কের মুক্তি-যুদ্ধে এই নারীকে তাঁহাদের অগ্রদূত রূপে স্বীকার করিয়া লইলেন।

তুরস্কের এই বীর রমণী—যাঁহার কর্ম্মশক্তি তুরস্কের আঁধার-গগনের

কালিমাকে বিদূরিত করিয়া উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কিরণ বিকীরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাঁহার জীবনী এক অদ্ভুত হেঁয়ালিতে পূর্ণ। কতকগুলি বিভিন্নমুখী উপন্যাসের চরিত্র যেন তাঁহার মধ্যে একত্র সন্নিবেশিত ছিল। দুঃখ, বিষাদ, হর্ষ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রায় সবগুলিই তাঁহার মধ্যে তরঙ্গায়িত হইয়াছিল। তিনি মিষ্টভাষিণী ও ক্ষীণাঙ্গী। তাঁহার দুর্ব্বল শরীর দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না যে এই রুগ্না নারীর মধ্যে এত তেজ লুক্কায়িত আছে।

হালিদা হানুমের পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারা তাহাকে দুনিয়ার কাছে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি মোসলেম-জগতের প্রথম নারী গ্রাজুয়েট এবং কনষ্টাণ্টিনোপলের পাশ্চাত্য ধরণের নারী কলেজ হইতে সুখ্যাতির সহিত বি-এ পাশ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ফরাসী ও ইংরাজ রমণীগণের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা হানুমের ব্যবহারে এতদূর সন্তুষ্ট হইতেন যে তাঁর সুখ্যাতিতে তাঁহারা পঞ্চমুখ হইতেন। কষ্ট-সহিষ্ণুতা হানুমের অন্যতম গুণ ছিল; দুর্ব্বল শরীর লইয়াও তিনি দারুণ শীতের সময় কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সুদূর আঙ্গোরা পদব্রজে ও অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করিয়াছেন। এত পরিশ্রমে যে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে তাহা তিনি ভাবিবারও সময় পান নাই। কিসে তুর্কী জাতির মঙ্গল হইবে, কিসে তুরস্কের অমানিশা কাটিয়া যাইবে এই চিন্তাই তাঁহাকে পাগল করিয়া ফেলিয়াছিল।

তুরস্কের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার পরও হালিদা হানুম নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। শিক্ষার মশাল হস্তে তিনি প্রত্যেক তুর্কীর আঁধার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি শিক্ষার ভার অন্যের

হ্লাতে ছাড়িয়া নিশ্চিত হইতে না পারিয়া তুরস্কের দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষা-মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। নব্য-তুর্কী বিস্ময়ে তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের পাশ্চাত্য-সাধনার সাফল্য মর্শ্মে মর্শ্মে অনুভব করিল। মহাবীর কামাল পাশাও তাঁহাকে উপদেষ্টা হিসাবে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। হালিদা হানুম সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া জগতে যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহা অনন্য-সাধারণ।

হালিদা হানুমের জীবনী তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছেন অন্য কাহারও দ্বারা তাঁহার বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক কিছু জানা যায় না। তাঁহার গ্রন্থে জানা যায় যে, একজন নারী হইয়া তিনি দেশের স্বাধীনতা, সমাজের সংস্কার ও মানুষের একতা ও সাম্যভাব আনয়নের জন্য যাহা করিয়াছেন ছুনিয়ার ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। একটা ঈর্ষা পরায়ণ আত্মকলহরত পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য মানুষের মধ্যে যে কর্ম্মপ্রেরণার আবশ্যক—তাঁহার মধ্যে সে সকলের সন্ধান পাওয়া যায়।

জাতীয়তার উপাসক হিসাবে তিনি বলিয়াছেন যে "একটা জাতি যদি সেই জাতির কিংবা অপর জাতির প্রত্যেককে উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সাহায্য করে তাহাকেই বলে জাতীয়তা; এবং আমি ইহা বিশ্বাস করি যে একটা জাতির দুঃখ-বেদনা জানার আন্তরিক আগ্রহ, এবং এই ভাবের আদান প্রদান মানুষকে পরস্পরের মধ্যে খাঁটী ভালবাসার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে এবং সেই ভালবাসাই মানুষকে লক্ষ্যের পথে পৌঁছাইয়া দেয়।"

হালিদা হানুমের আপ্রাণ চেষ্টা ও মোস্তফা কামালের অসীম বীরত্বের ফলে আঙ্গোরার গবর্ণমেণ্ট একটী শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত হইল। হালিদা হানুমও তুরস্কের জাতীয় মহাসভায় কামালের সহিত

কাজ করিলেন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইল। দেশের মধ্যে কামালের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কাজেই অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কামালপাশা তুরস্কের ডিক্‌টেটর হইলেন। হাসুম ও তাঁহার স্বামী ইহাতে খুবই আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে কামালের প্রভুত্বের অধীন হইয়া থাকা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াও তিনি দেশকে ভুলিতে পারেন নাই। তুর্কী সৈন্যগণকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, তাহারা তাঁহাকে তুরস্কের জননী বলিয়া সম্বোধন করিত। মোস্তফা কামালের সহিত মতদ্বৈধতা থাকিলেও তিনি তাঁহার উপর বিরক্ত হন নাই। যখন তিনি মোস্তফা কামালের সম্বন্ধে কথা বলিতেন, তখনই তাঁহার কথার মধ্যে স্নেহের একটা আবেশ ধরা পড়িত। কারণ তিনি জানিতেন যে মোস্তফা কামালও দেশের জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার চোখের সামনেই দেশের জন্য অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। তুরস্কের নিপীড়িত জনগণের নিঃস্বার্থ সেবিকা যে হালিদা হাসুম, তাহা তুরস্কের প্রত্যেক নরনারী ভালরূপেই জানে এবং এই কারণেই তাহারা ইঁহাকে এত ভালবাসে।

জাতির মুক্তিকামী এই মহীয়সী নারী বলেন "জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, জাতিকে শাসন করিবার জন্য ও সঠিক পথে চালাইবার জন্য কোন ডিক্‌টেটরের প্রয়োজন নাই, দেশের মুক্তির জন্য যারা প্রাণ দিয়াছে তাদের রক্তের স্মৃতিটুকুই তুর্কী জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট।" দেশকে তিনি নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি দেশের লোককে এত বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন।

দেশকে ভালবাসার এত উচ্চ আদর্শ শুধু তুর্কী জাতির ইতিহাসে কেন—দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল।

তুর্কী 'জোয়ান-অব্-আর্ক্'

ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু, আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র দর্শনের অধ্যাপক। তিনি "ফরোয়ার্ড" পত্রে ১৩৩৫ সালে তুর্কী 'জোয়ান-অব-আর্ক' হালিদা এদিব হানুম সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। নিম্নে পত্রখানির সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

ম্যাডাম হালিদা এদিবের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি নবীন তুর্কীর জীবন-বাণীর ব্যাখ্যাতা—তাঁহার মতো নারী তুরস্কে বেশী নাই। তাঁহার মতামত অত্যন্ত উদার—আধুনিক উন্নত চিন্তার সহিত তাঁহার মন সমসূত্রে গ্রথিত। এজন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই নব্য তুর্কীদের যাবতীয় গঠনমূলক কার্য্যেরই সমর্থন করেন। তিনি এক সময়ে নূতন তুর্কী গবর্ণমেণ্টের একান্ত বিশ্বাসের পাত্রী ছিলেন। সে-সময় তিনি প্রথম শিক্ষামন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। শোনা যায়, সম্ভ্রান্ত তুর্কী মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বোরূকা পরিত্যাগ করেন। এখন অধিকাংশ তুর্কী নারীই বোরূকা ত্যাগ করিয়াছেন—আগেকার অবরোধ আর নাই। যুগ যুগ ধরিয়া তুর্কী নারীদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল। এহেন সমাজে ম্যাডাম হালিদা এদিবের আবির্ভাব একটা অভাবনীয় ব্যাপার। নবীন এসিয়ার সামাজিক জীবন কোন্ পথে চলিয়াছে—ইহাতে তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ম্যাডাম এদিবকে অনেক সময় তুরস্কের প্রথম নারী রাজনীতিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু তিনি বলেন, আমি মোটেই

রাজনীতিক নই, হইলে অতি নিম্নস্তরের রাজনীতিক হইতাম। তিনি আরো বলেন, আমি একজন লেখিকা মাত্র। আমি কোনো রাজ-নৈতিক দলের সভ্য হইলে বিরুদ্ধ দলের কার্য্যেও অনেক কল্যাণ দেখিতে পাইতাম; কিন্তু রাজনীতিতে তো তাহা চলে না।

হালিদা এদিবের স্মৃতিলিপি (Memoirs of Halida Edib) নিউইয়র্কের সেন্চুরি কোম্পানী ১৯২৬ সালে বাহির করেন। বইখানি জগতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ম্যাডাম এদিব রাজনীতিক হোন বা না হোন, তিনি যে একজন অসাধারণ নারী তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। তিনি তুর্কী নারীদিগকে একটা নূতন পথে চালিত করিয়াছেন। জাতির সেবায় তাঁহার স্বাধীন মতিগতি দেখিয়া হাজার হাজার নারী ঐরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে তুরস্কের অনেক লাভ হইয়াছে।

ম্যাডাম এদিব ভারতীয় নেতা ডাক্তার আন্সারীকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। (এই সময় ডাক্তার আনসারী তাঁহার বিখ্যাত মেডিকেল মিশন সহ তুরস্কে গিয়াছিলেন।) তিনি কখনো ভারতে যান নাই, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান স্বামী—ইনি একজন ডাক্তার—কয়েক বছর আগে ভারত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। ম্যাডাম হালিদা এদিব ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমস্ত খবরই রাখেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত, স্বাভাবিক অধিকার। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে খোদা প্রত্যেক জাতিকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়াছেন।

হালিদা বলেন,—"ভারতে হিন্দু ও মুসলমান যে এক হইয়া জাতির বৃহত্তর সেবার কাজ করিতে পারে না—এটা একটা মস্ত দুর্ভাগ্যের

কথা। ধর্ম্ম লইয়া বাদ-বিসম্বাদ করা একটা বড় রকমের বোকামী। এ হয় তো ঠিক যে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্য হইলে দুই সম্প্রদায়কে নিকট আত্মীয়রূপে আরও বেশী শক্ত করিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করা দরকার।

তিনি বলেন, শত্রুর সম্মুখে আত্মকলহ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এসিয়ার এই সঙ্কট-সময়ে যাহারা ধর্ম্মীয় কলহ সৃষ্টি করে, তাহারা দেশদ্রোহী। এইরূপ কলহ দেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়ার জন্য কিছু চেষ্টা হওয়া দরকার।

তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—"ভারতীয় খেলাফৎ আন্দোলনে কি তুরস্কের কোনো উপকার হইয়াছিল? ভারতীয় মুসলমানেরা তুরস্কের জন্য বিপুল স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন; তাহা কি আপনার দেশবাসীরা তাঁহাদের নিজেদের পক্ষে মূল্যবান মনে করেন?"

হালিদা এ-প্রশ্নের যে উত্তর দেন তাহা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থপূর্ণ। তিনি বলেন,—"খেলাফৎ আন্দোলনে আমাদের কোনো উপকার হয় নাই বলিলেই চলে। ইহাতে বিশেষ কোনো কাজ হয় নাই। অতীত ইতিহাসের ইহা একটী তুচ্ছ ঘটনা মাত্র—এখন আর তাহা প্রায় কারুর মনে নাই। তুর্কীরা যোদ্ধার জাতি; তাহারা ভারতের মতো পরাধীন দেশের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করে না।"

হালিদার এই জবাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তুর্কীরা ইস্‌লামের আন্তর্জ্জাতিকতার ধার ধারেন না। তাঁহারা জাতীয়তাকে একটা অবাস্তব আন্তর্জ্জাতিকতার সম্মুখে বলি দিতে রাজি নন। তাঁহাদের আশঙ্কা এই যে, ঐরূপ করিলে দেশপ্রেম তুর্কীদের মন হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইবে।

হালিদা এদিব হানুম বেশী লম্বা নন—উঁচুতে প্রায় পাঁচ ফিট। তিনি ঈষৎ শ্যামাঙ্গী—বেশী কালো নন। তাঁহার চোখ দুটি যেন কি এক অজ্ঞাত রহস্যে পরিপূর্ণ—তাঁহার করুণ-বিনম্র স্বভাব শুধু ভদ্র বলিলে যথেষ্ট হয় না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সহজেই সবাইকে আকর্ষণ করে। তাঁহার গাউন আমেরিকান—একেবারে হাল ফ্যাশানের, রেশমের ষ্টকিং, উঁচু গোড়ালীওয়ালা জুতা। তাঁহার চুল পিছনে ছাঁটা (bobbed); ওড়না পরেন খুব জাঁকালো রকমের, কিন্তু দেখিতে খারাপ নয়।

তাঁহার চোখ মুখ দেখিলে মনে হয় না যে তিনি এককালে বিপ্লবের আগুন লইয়া খেলা করিয়াছেন। তাঁহাকে সৈনিকের পোষাক-পরিহিত অবস্থায় কল্পনা করাও যেন দুঃসাধ্য। তবু একথা সত্য যে তিনি সৈনিকের কাজ করিয়াছেন। হালিদা এদিবের মধ্যে নারীত্বের ভাব এত বেশী প্রস্ফুটিত যে, তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা বিশ্বাস করিতে বাধো বাধো লাগে। তুর্কীরা যখন গ্রীকদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন হালিদা সার্জ্জেণ্ট হইয়া কামালের সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং সাকারিয়ার সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন। ২৩ দিন ব্যাপী কী ভীষণ যুদ্ধ সে! সত্যই তাঁহার জীবন-কাহিনী অতি চমৎকার—পিয়েরী লোটীর Disenchantedএর মতোই অদ্ভূত।

১৯০৮ সালে বিপ্লবের সময় হালিদা একটী দেশপ্রেমাত্মক কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটীতে যে উন্মাদনা ছিল, তাহা সমগ্র তুরস্ককে একেবারে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। বিপ্লবের পর তুরস্কে জ্ঞানসাধনার এক নব-যুগের সঞ্চার হয়; হালিদা তাহাতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং সামরিক নেতাদের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকেন। এই সময় লোকে তাঁহাকে "সৈনিক হালিদা" বলিয়া ডাকিত।

• বলকান যুদ্ধের সময় তিনি নারীদের সভায় বক্তৃতা করিতেন। তখন নারীরা হাতের আংটী, বলয় প্রভৃতি খুলিয়া যুদ্ধের জন্য দান করিতেন। ১৯১৯ সালে কনষ্টান্টিনোপলে ইংরেজেরা খুব প্রাধান্য অর্জ্জন করেন। এই সময় এক সভায় সমবেত লক্ষাধিক তুর্কিকে সম্বোধন করিয়া তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার ফলে এত বেশী উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল যে, ইংরেজেরা অতঃপর এই রকম আর কোনো সভা বসিতে দেন নাই।

হালিদার প্রথম স্বামী দ্বিতীয় আর একটী স্ত্রী গ্রহণ করাতে তিনি তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করেন এবং নিজেই তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি ডাক্তার আদনান বে-কে বিবাহ করেন। ডাঃ আদনান বে রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটী ও সামরিক চিকিৎসা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি তুর্কী জাতীয় মহা-সমিতির (Turkish Nationalist Assembly) সভাপতি নিযুক্ত হন।

হালিদা এদিব চিন্তাজগতেও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি বলেন, "আমার কাছে কোনো ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নয়। প্রত্যেক ধর্ম্মে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমি তাহাই গ্রহণ করি। তাঁহার মত এই যে, ইসলাম ধর্ম্মই তুরস্কের উপযুক্ত ধর্ম্ম। মুসলিমের কাছে ধর্ম্ম মানে সামাজিক ন্যায় বিচার। যদি কেহ কোনো মুসলমানকে এক গালে চড় মারে, তবে সে তৎক্ষণাৎ চড় মারিয়া তার প্রতিশোধ দেয়। এরূপ না করিলে ধ্বংস তার অনিবার্য্য।"

আমেরিকার একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে ম্যাডাম্ হালিদা এদিবকে আমি একবার বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি। তুর্কী জাতীয় শক্তির উত্থান কোন্ সূত্র ধরিয়া কেমন করিয়া হইল, ম্যাডাম

হালিদা তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং নব্য তুর্কী-গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী হইবে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

প্রাচীনেরা অবস্থার চাপে মাথা নোয়াইয়া থাকে; কিন্তু নবীনের ধর্ম্ম তাহা নয়। সে যে-কোনো বাধার সম্মুখীন হইতে চায়। নব্য তুর্কীরাও ঠিক ইহাই করিয়াছিল। হালিদা আরো বলেন, তুর্কীরা রাষ্ট্র-গঠনে পারদর্শী। তাঁহারা রাষ্ট্রের মঙ্গলকেই সকলের আগে স্থান দেন। তাঁহারা দেখিলেন, প্রাচীন আইন-কানুন বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নয়, সুতরাং তাঁহারা সেগুলি পরিত্যাগ করিলেন। খেলাফৎ তুলিয়া দিলেন। নারীকে বহুবিধ বিধি-নিষেধের গণ্ডী হইতে মুক্ত করিলেন। এখন কেবল এক ভোট অধিকার ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তুর্কী নারী ও পুরুষের অধিকারে কোনো প্রভেদ নাই।

ম্যাডাম্ হালিদা ইহাও বলেন যে, তুরস্কের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত সম্ভব হইয়াছিল কেবল নারীশক্তির প্রেরণায়। তুর্কী নারীরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ১৯০৮ খৃঃ অব্দের বিপ্লব কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে জনসেবা, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি কার্য্যের জন্য নারীদের শতশত সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দিবা স্কুল ও নৈশ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া গিয়াছে; আর তারই ফলে তুরস্কে আজ একজনও নিরক্ষর তুর্কী নারী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের সময় তুর্কী নারীদের গৌরব আরো বর্দ্ধিত হয়। তাঁহারা তখন গ্রীকদের বর্ব্বরোচিত অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে শত শত প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন এবং যে সকল নিরাশ্রয় ব্যক্তি গ্রীকদের হস্ত হইতে কনষ্টাণ্টিনোপলে পলাইয়া আসেন তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করেন।

১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুর্কী নারীরা জীবনের সর্ব্বকার্য্যে যোদ্ধ পুরুষদের স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা সরকারী আফিস আদালতের কার্য্য, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি কোনো কাজেই পশ্চাৎপদ হন নাই। শেষে যান বাহনাদির যাবতীয় বন্দোবস্তের ভারও নারীরা গ্রহণ করেন।

১৯১৬ সালে তুরস্কের পারিবারিক আইনের ঘোর পরিবর্ত্তন করা হয়। 'হেরেম' প্রথা একদম তুলিয়া দেওয়া হয় এবং সুলতান ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ঐ বৎসরেই তুর্কী নারীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে তুরস্কে ট্রামগাড়ীতে, নৌকায় ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে স্ত্রী-পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত; এই দুই স্থানের মাঝখানে পর্দ্দা টাঙানো থাকিত। কিন্তু ইহার পর হইতে এই সব পর্দ্দা একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হয়। এখন স্ত্রীপুরুষ সকলেই অবাধে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। নারীরা এখন থিয়েটারে অভিনেত্রীরূপেও অবতীর্ণা হইতেছেন।

খালেদার বক্তৃতা

গত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় যখন তুর্কীপুরের তোরণে তোরণে শতসিংহ গর্জ্জাইয়া উঠিয়াছিল, দেশভক্ত লক্ষবীরের রক্তস্রোতে তুরস্কের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত লালে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় তুরস্কের রাজকীয় ইউনিভার্সিটী গৃহে তুর্কী-নারীদের বিরাট সভায় তুর্কী-জননী হালেদা হানুম যে প্রাণোন্মাদিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—

"ভগ্নিগণ,—আজ দেশের প্রেমে পাগল সেজে ইস্‌লাম-মদিরায়

তুর্কী জোয়ান-অফ-আর্ক

হালিদা এদিব হানুম

বিভোর হওয়াই সবার চাইতে বড় কাজ। জাতির প্রেমই তুর্কিকে দুনিয়ায় সব চাইতে বড় জাত ক'রে তুলেছিল—শ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নীত ক'রেছিল—আর আজ সে প্রেম-মদিরা ভুলে গিয়েই আমরা আমাদের অকলঙ্ক ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কের মসী লেপন ক'রেছি—পরের শত লাঞ্ছনা নীরবে বরণ ক'রে নিয়েছি। একবার বুলগার জাতির দিকে চোখ ফিরাও ভগ্নিগণ! পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে এরা আমাদেরই দুগ্ধ-সরবরাহকারী গোয়ালা ছিল। কিন্তু দেশের প্রেমই আজ এদের মানুষ ক'রে তুলেছে—তিলকে তাল ক'রে দিয়েছে। সারা ইয়োরোপ আজ এদের শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌ছে। আজ ওরা দাস হ'য়ে সম্মানের জীবন যাপন ক'রছে, আর আমরা প্রভু হ'য়ে অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছি। লজ্জা ও অপমানের শত আঘাতে আজ আমাদের ডুবে মরাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? আমাদের এ দুর্গতির জন্যে এ দেশের নারীরাই সম্পূর্ণ দোষী। প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মের জীবন্ত আলেখ্য এঁকে দেওয়া, আর প্রতি প্রাণে জাতির কাজে মস্তক দানের তীব্র উন্মাদনা জাগিয়ে দেওয়া—এ ত রমণীদেরই 'ফর্‌জ্' (অবশ্য কর্ত্তব্য); কিন্তু আমরা কি আমাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রে তুর্কি জাতির বীরনামে কালিমা লেপন করিনি? ভগিনিগণ! নিরাশ হ'লে চ'লবে না। জাতির অস্তিত্ব-সূর্য্য এখনো চিরতরে ডুবে যায় নি—এখনো সাবধান হ'লে আমরা অসাধ্য সাধন ক'রতে পারি। ফরাসী দেশের অবস্থা দেখেও কি আজ তোমাদের চোখ খুলবে না? চল্লিশ বছর পূর্ব্বে এই ফরাসীরাই জার্ম্মাণের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হ'য়ে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অংশ ছেড়ে দিয়েছিল; কিন্তু দেশ-প্রেমের অগ্নি-শিখা তাদের প্রাণে প্রাণে প্রজ্জ্বলিত ছিল ব'লেই আশা তাদের ত্যাগ করে নি; পঁচিশ বছরের মধ্যে আবার তারা হৃত রাজ্যের উদ্ধার

ক'রেছে—জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতে পরিণত হ'য়েছে। অধিক দূর যেতে হবে না। গ্রীকের দিকে একবার তাকাও ভগ্নিগণ! শত শত বছর ধ'রে এরা আমাদেরই দাসত্বের বোঝা বহন ক'রেছে। স্বাধীনতার মানে পর্য্যন্ত জান্‌ত না, রাজধানী আথেন্স একটা পুতিগন্ধময় অশ্বশালার মতই ছিল। কিন্তু আজ তাদেরও যুগান্তর এসেছে—আথেন্স আজ সৌন্দর্য্যে ও শুদ্ধতায় ভ'রে উঠেছে। স্তাম্বুলের সঙ্গে প্রতিযোগীতা ক'রতে কোমর বেঁধেছে।

"ভগ্নিগণ! সম্মুখে সহস্র বিপদ আসুক—ঝড়-ঝঞ্ঝা আঁধার ক'রে আসুক—অশনির তালে তালে অম্বুধি কেঁপে উঠুক—স্মরণ রেখো ভগ্নিগণ! তুর্ক জাতি কখনো মুছে যাবে না। তুর্কির অতীত ইতিহাসই তুর্কির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে প্রাণদান ক'রবে। তুচ্ছ বলকানের এ ক্ষুদ্র শক্তিসঙ্ঘ!—যদি সমগ্র দুনিয়া এসে আজ আমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তবুও ভীত হ'য়ো না। দেশ-মায়ের ঐ যে লক্ষ লক্ষ দীনা কন্যা আজ দেশের মুক্তির জন্য খাট্‌ছেন, তাদের বুকে টেনে নাও। যতদিন জাতির গৌরব-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে বিরত হব না। আজ এস এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই ভগিনিগণ! প্রার্থনা করি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমাদের 'ঈমান' (ধর্ম্ম-বিশ্বাস) বহাল থাক।"

পারস্যে নারী জাগরণ

পারস্য-সভ্যতার ইতিহাস বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান পাওয়ার যোগ্য। লিখিত ইতিহাসের যে যুগ, তার আগেই ইরাণীরা জরথুস্ত্রের প্রভাবে সমাজবদ্ধভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সমাজের ক্রমোন্নতির নানারকম নিয়ম ইনি করেন, সেগুলি সবই প্রায় উচ্চ অঙ্গের।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে পারস্যে আকৃমানীয় বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই সময় সমাজের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল, কারণ তখন জরথুস্ত্রের নিয়মই সকলে পালন করিতেন। এর পরই আলেকজান্দার দিগ্বিজয় করিতে বাহির হন, এবং ভারতবর্ষে আসার পথে পারস্য জয় করেন। কিন্তু তিনি দেশ জয় করেন মাত্র, দেশের সভ্যতাকে জয় করিতে পারেন নাই; গ্রীক সভ্যতার যেটুকু প্রভাব ইরাণের উপর পড়িয়া ছিল, তাও অল্পদিনের মধ্যেই লুপ্ত হইয়া যায়, এবং সাসানীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্রই ইরাণী সভ্যতা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত এই ধারাই সমানে চলিতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের পতাকা পারস্যে দেখা দেয়, তখন হইতে সকল দিকেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

আকৃমানীয় এবং সাসানীয় রাজত্বকালে নারীর অবস্থা খুব উন্নত ছিল। যে কোনো আধুনিক মানুষ, নারীর জন্যে যা-কিছু অধিকার চাইতে পারেন, প্রায় সবই তখন বর্ত্তমান ছিল। তাঁদের সকলেই সম্মানের চক্ষে দেখিত, এবং সকল দিকেই তাঁদের অধিকার পুরুষের

সমকক্ষ ছিল। দেশবাসী সকলেই শিক্ষিত এবং উন্নত মতাবলম্বী হওয়াতে, এবং মতের ও চিন্তার আদান-প্রদান থাকাতে এই অবস্থা সম্ভব হইয়াছিল। বিবাহ-সম্বন্ধের গৌরব সকলেই স্বীকার করিতেন, এবং সামাজিক সব নিয়মই সেই স্বাধীনযুগের উপযুক্ত ছিল।

কিন্তু মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে সমস্তই অন্যরকম হইয়া গেল। নূতন এক জাতি, নূতন সামাজিক নিয়মাদি লইয়া আবির্ভূত হইলেন। পুরাতন ইরাণী সভ্যতা ও এই নূতন সভ্যতার মধ্যে এত পার্থক্য ছিল যে, দুটীর মধ্যে কোনো রফা করা সম্ভবপর হইল না। অগত্যা পুরাতন যেটী তাকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় লইতে হইল ও নূতনটী রহিয়া গেল। ফলে এই নূতন সভ্যতার আওতায় পড়িয়া নারীজাতি নূতন নূতন বাধা নিষেধের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িলেন। এবং গৃহের প্রাচীরের মধ্যে বহু শতাব্দীর মত তাঁরা অবরুদ্ধ হইলেন।

এই অবরোধই বহু শতাব্দি ধরিয়া পারস্যের বুকের উপর বিষম চাপিয়া বসিল। হেরমের আঁধার প্রাচীরে পারস্য নারীর ব্যথার কান্না আঘাত হানিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল, আলোর মুখ দেখিতে পাইল না। তখনকার নারীরা অন্দরমহলের যে অংশে বাস করিতেন সেটাকে "অন্দরুন" বলা হইত। এখানে তাঁরা পুরুষের খেলনার মত বাস করিতেন, তাঁদের বয়স বাড়িত কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি কিছুরই বিকাশ হইত না। তাঁরা সকলপ্রকার শিক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, অক্ষরজ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁদের ছিল না, এবং জগৎ ও মানবজীবন সম্বন্ধে কোনো উদার ধারণাও তাঁদের ছিল না। অন্দরমহলের আবহাওয়া একেবারে শ্বাসরোধকারী এবং শোচনীয় ছিল। অবস্থাটা আরও ঘৃণ্য ছিল এইজন্য যে একই মহলে একজন পুরুষের সকল পত্নী এবং উপপত্নীরা বাস করিতেন। সুতরাং, এই হতভাগিনীদের মধ্যে সারাক্ষণই প্রভুর

ভালবাসা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া থাকত। ফলে নানারকম ষড়যন্ত্র, পাপাচরণ, হত্যা প্রভৃতির বিভীষিকা অন্দরমহলের জীবন-ধারাকে পঙ্কিল করিয়া রাখিত। প্রভুর সুনজরে না পড়িলে সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই তাঁদের অদৃষ্টে জুটিত না; সুতরাং প্রভুর প্রিয়পাত্রী হওয়ার চেষ্টাই তাঁরা যথাশক্তি করিতেন। যাতে কোনো রকমে তাঁর বিরাগ ভাজন না হন, সেদিকে তাঁরা খুবই সতর্ক থাকিতেন। তাঁরা শুধু পর্দ্দানশীন্,—মানুষের কোনো অধিকার তাঁদের ছিল না। যদি প্রভুকে খুসি না করতে পারিতেন, যদি তাঁদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইত, অথবা যদি তাঁদের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ না করিত, তখনই তাঁদের পরিত্যক্তা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিত।

কিন্তু এটা ছিল উচ্চশ্রেণীর এবং ধনীবংশের নারীদের জীবনযাত্রার প্রণালী। এঁরা কেবল উপভোগের জিনিষ হইয়াই দিন কাটাইয়া দিতেন। দরিদ্রের ঘরে নারীর অবস্থা ছিল মানুষ এবং জানোয়ারের মাঝামাঝি। স্ত্রীদের দ্বারা চাষবাস, মোট বওয়া প্রভৃতি কাজ বিনা বেতনে বেশ করান যায়, ইহা পুরুষেরা বেশ বুঝিত, এবং যথাশক্তি বহু বিবাহ করিয়া যাইত। অনায়াসে বিবাহবিচ্ছেদও চলিত, সুতরাং নারী-দের পাপব্যবসায়ে লিপ্ত করাতেও বিশেষ বাধা ছিল না। উচ্চবংশের ভিতর পর্দ্দা এবং বোর্‌কার কড়াকড়িটা খুব বেশী ছিল, চাষাভুষোর ভিতর এতটা ছিল না। স্ত্রীলোকেরা কোথায়ও যাওয়া আসা করার সময় বোর্‌কা ব্যবহার করিতেন।

উচ্চবংশের নারীদের মধ্যে হাজারকরা তিনজন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানিতেন, সাধারণ শ্রেণীর মেয়েরা এবং যাযাবর শ্রেণীর মেয়েরা প্রায় পশুর মতই মূর্খ ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা বিশুদ্ধ পারসিক ভাষা বুঝিতে পারিতেন না, তাঁরা একপ্রকার মিশ্র ভাষায় কথা বলিতেন,

এটাকে 'ধারী' বলা হইত। তাঁদের দৈনিক জীবনযাত্রা এত একঘেয়ে ছিল, যে তা কল্পনা করা শক্ত। এক যদি কোথাও কোনো উৎসবে তাঁরা যাইতেন বা বিদেশযাত্রা করিতেন, তাহইলে একটুখানি বৈচিত্র্যের স্বাদ পাইতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরা 'হামাম্' নামক স্নানাগারগুলিতে যাইতেন, এখানে মেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, গল্প করা হইত, অনেক ঘণ্টা ধরিয়া চা-পান, সরবৎ পান প্রভৃতি চলিত। কিন্তু তাঁদের স্বাধীনতা রাজবন্দীর স্বাধীনতার মতই ছিল, তার বেশী নয়। পেশোয়াজ এবং ঢিলা জ্যাকেট, এই তাঁদের সাধারণ পোষাক ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁদের পোষাকের একটু পরিবর্ত্তন হয়। তখনকার সম্রাট শাহ নাসিরউদ্দিন ইউরোপ ভ্রমণ করিতে যান। ইউরোপের রঙ্গমঞ্চের নর্ত্তকীদের পোষাকটা তাঁর খুব পছন্দ হয়, এবং ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিজের 'হারেমে' এই পোষাকের প্রচলন করেন। সম্রাটের অন্দরমহলে যা চলে তাই ফ্যাশান, সুতরাং অন্যান্য ধনী গৃহেও ক্রমে এটার চলন হইয়া যায়। কিন্তু বাইরের লোকে অবশ্য এ পরিবর্ত্তনের কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইল না, কারণ প্রকাশ্যে বেরুবার সময় সেই সাবেকী বোরকা চাপা দেওয়া সমানে চলিতে লাগিল।

মেয়েদের অবস্থার ক্রমেই অবনতি হইতে লাগিল এবং এক সময়ে সেটা এত শোচনীয় হইল যে আর উদ্ধারের আশাও প্রায় কারো মনে রহিল না। কিন্তু বহু পূর্ব্ব হইতেই নারীর ভিতর বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। তারপর একটু রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে এই বিদ্রোহ তার সমগ্র রূপে মাথা খাড়া করিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পারস্যে যুগমানব রেজা শাহ পাহ্লবী কাজর শাহের হাত হইতে শাসনভার কাড়িয়া লয়েন।

এইবার নূতন যুগের আবির্ভাব হইল, "পারস্য দেশ সেবিকা সঙ্ঘ" নামক একটি নারী সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হল।

উন্নতিপন্থীদের যথেষ্ট বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে। সনাতনপন্থীরা সকল দেশেই এগিয়ে চলাকে ঠেকাইতে চেষ্টা করেন, পারস্যেও তার ত্রুটি হয় নাই। যা হোক, এই নারীসঙ্ঘ এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ করিতে পারিতেছেন। এই সমিতি পারস্যের নারীর অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে। এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলা যায়। প্রধানতঃ ছয়টি বিষয়ে তাঁরা মনোযোগ দিয়াছেন, সেগুলি এই,—

(১) স্ত্রী-স্বাধীনতা ; তাঁদের অবগুণ্ঠন-মোচন এবং অবরোধ-মোচন।

(১) সামাজিক, নাগরিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে তাঁদের পূর্ণ অধিকার-লাভ।

(৩) ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকাদের বিবাহ রোধ করা।

(৪) বহুবিবাহের সমূলে উচ্ছেদ করা।

(৫) বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিলে, স্বামীর নিকট কন্যাপণের টাকা আদায় করা।

(৬) নারীদের অবাধে মেলামেশা করার অধিকার লাভ, এবং বিরোধীপক্ষের সহিত তর্কযুদ্ধ করার অধিকার লাভ।

এই সবকটি উদ্দেশ্যই মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী না হইলেও সামাজিক নিয়মের বিরোধী। মোল্লা সম্প্রদায় সমগ্র নারীজাতিকে যে দুর্গতির ভিতর রাখিয়াছেন, এটা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

সনাতনপন্থী মোল্লারা এবং তাঁদের শিষ্যেরা এই সমিতিগুলির উপর খড়্গহস্ত। এতদিন পর্য্যন্ত সম্রাটের সাহায্যে তাঁরা এই সকল শাস্ত্র-বিরোধী ব্যাপারকে ধ্বংস করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক যুগে নারী-স্বাধীনতার মন্ত্র যাঁরা প্রচার করিয়াছেন, তাঁদের

ভিতর হাজী মির্জ্জা আবুল কাসিম আজাদ এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী খানুম্ সাহনাওয়াজ্ আজাদ প্রথম। এঁরা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পর্দ্দাপ্রথা তুলিয়া দিবার চেষ্টা করেন এবং একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমিতি হইতে একটি ছোট মাসিক পত্রও বাহির করা হইত। কিন্তু নানা জায়গা হইতে তাঁরা বিরুদ্ধতা লাভ করিতে লাগিলেন, বিশেষ করিয়া ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের কাছ হইতে। ফলে আড়াই বৎসর পরেই পত্রিকাখানির প্রচার বন্ধ হইয়া গেল, এবং সমিতির উদ্যোক্তা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তিহরাণ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাব্রিজে বন্দী হইলেন। বন্দীদশা, কারাগারের অমানুষিক অত্যাচার, কিছুই এই কর্ম্মীপুরুষকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই, এবং এখনও তিনি পারস্যের নারীজাতির উন্নতিকল্পে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন।

হাজী মির্জ্জা আজাদের যে সকল বন্ধু তিনি নির্ব্বাসিত হইবার পরেও তিহরাণে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফোরুক উদ্দিন্ নামে এক ব্যক্তি, সস্ত্রীক আবার এই কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। এঁদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল, তার নাম 'জাহাজানা'। এটিও কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামীর অত্যাচারে টিকিতে পারিল না, এবং সমিতির সকলেই প্রায় কুম্ নামক স্থানে নির্ব্বাসিত হইলেন।

এখন হইতে নয় বৎসর পূর্ব্বে আবার এই প্রচেষ্টা সুরু হইল। এবার কাজের ভার লইলেন, একজন নারী। তাঁর নাম লেডী খানুম্ মাহতাব্ খান্ এস্কান্দেরী। তিনি কয়েকজন সুশিক্ষিতা আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা মহিলাকে একত্রিত করিয়া সম্প্রতি যে দেশসেবিকা সঙ্ঘের কথা বলা হইল, তার ভিত্তিস্থাপন করেন। নারীর কাজের ভার নারী যখন স্বয়ং হাতে তুলিয়া লন তখন তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

পারস্যে নারী-প্রগতির মন্ত্রগুরু

রেজা শাহ্‌ পাহ্‌লবী

এইবার সমিতিটি টিকিয়া গেল, মোল্লাদের ক্রোধেও এটি ভস্মীভূত হইল না। পারস্যের নারী সমাজ এই মহীয়সী মহিলার কাছে চিরঋণী।

এঁকেও অনেক উৎপাত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। পথে ঘাটে, অসভ্য মানুষে এঁর উপর ঢিল ছুঁড়িয়াছে, অকথ্য ভাষায় এঁকে গালি দিয়াছে। এমন কি গবর্ণমেণ্টও কয়েকবার এঁকে নানাস্থানে অন্তরীন্ অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যার জন্য তিনি এত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, সেই সমিতিটি টিকিয়া থাকিয়া তাঁর সকল কষ্ট সার্থক করিয়াছিল। দিন দিন এটির উন্নতি হইতে লাগিল। এই উন্নতির জন্য অবশ্য একটি মানুষের সাহায্য অনেক পরিমাণে দায়ী। ইনি প্রধান মন্ত্রী বাহ্‌রাম শাহ্। ইনি নিজে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার পরিপোষক ; এ বিষয়ে ইনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

লেডী এস্‌কান্দেরীর মৃত্যুর পর, লেডী মাস্তর খানুম্ আফ্‌সার সাহস করিয়া এই কাজের ভার লন। ইনিই লেডী এসকান্দেরীর পরে সভানেত্রী হন। এই মহিলা আজারবৈজানের অধিবাসিনী, এবং বিদেশে নানাস্থানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এনি লেডী এস্‌কান্দেরীর উপযুক্ত সঙ্গিনী. তাঁর সমস্ত জীবন তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এটির নাম 'আক্‌বর মাদ্রাসা'। এখানে মেয়েদের মধ্যে মুক্তিমন্ত্র প্রচার করা হয়।

পারস্যের বর্ত্তমান সম্রাট রেজা শাহ্ পাহ্‌লবী এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সাহায্যে এখন এই সমিতির কর্ম্মশক্তি বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এবং দেশসেবিকারা আশা করিয়াছেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা পারস্যের নারীর মধ্যে যুগান্তর আনিয়া ফেলিতে পারিবেন। সমিতির অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আশ্‌রাফ তৈমুর বাসীর নাম করা যাইতে পারে।

ইনি মন্ত্রীসভার একজন সভ্য এবং স্ত্রীস্বাধীনতার স্বপক্ষে। নিজহস্তে ইনি নিজের কন্যার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়াছেন। 'আকবর মাদ্রাসার' আর একজন পৃষ্ঠপোষক মির্জ্জা জাহেদ্ খান্ মাহ্মুদী। ইনিও একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

এই সমিতি ইউরোপের নানাস্থান হইতে সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বসূচক অনেক পত্র পাইয়াছেন। এঁরা ভারতবর্ষীয় নারীসমিতিগুলির সঙ্গে যোগ দিয়া কাজ করিতে পাইলে অত্যন্ত খুসি হইবেন। এশিয়াবাসিনী-নারীসম্মিলনীর নিমন্ত্রণ পাইয়া, সর্ব্বপ্রথম এঁরাই সহকারিতা করিতে চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং প্রতিনিধিও পাঠাইয়াছিলেন। এঁরা যেরকম দুর্গতির ভিতর হইতে কেবলমাত্র আত্ম-চেষ্টায় আবার উঠিতে পারিয়াছেন, তা সকল দেশের নারীদের প্রশংসা পাইবার এবং অনুকরণ করিবার জিনিষ।

*　　　*　　　*

পারস্যের যে সকল মহিলা অতি অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা পাইয়া দেশের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :—

জোহরা খানম।—ইনি বর্ত্তমানে সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনিই পারস্যের একমাত্র মহিলা, যাঁহাকে গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইনি পারস্যে রাজ-প্রতি-নিধি হিসাবে ফিলাডেলফিয়ায় বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন।

মেহেরবানু।—তেহরাণের একজন নারী গ্রাজুয়েট। ইনি ইরাণের মহিলা আন্দোলনের প্রধানানেত্রী। ইঁহার নেতৃত্বেই ইরাণের "দেশহিতৈষিনী মহিলা সঙ্ঘ" গড়িয়া উঠে।

পারভিন খানম।—ইনিও একজন গ্রাজুয়েট ও ইরাণের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। ইঁহাকে রেজা শাহ রাজকবি হিসাবে রাজপ্রাসাদে আসিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি শাহের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

মাদাম আফিফা খানুম।—পারস্যের 'খিজার' পত্রিকার সম্পাদিকা।

মাদাম সিদ্দিকা খানম।—ইনি পারস্যের বিখ্যাত পত্রিকা "জবান-ই-জমান"-এর সম্পাদিকা।

ইরাকে নারী আন্দোলন

মহাবাহু মোস্তফা কামালের বিরাট কর্ম্মশক্তি ও স্বদেশের কল্যাণ-প্রচেষ্টা তুর্কী নারীসমাজকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে আত্ম-মর্য্যাদায় সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইরাকের মুসলিম নারী-সমাজ কামাল পাশার কর্ম্ম-শক্তির মধ্যে বা তুর্ক-নারীদের প্রগতির ভিতর দিয়াও নিজেদের প্রগতির প্রেরণা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত অন্ধ-সংস্কার জগদ্দল পাথরের মত তাহাদের প্রগতির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অন্ধ-সংস্কার তাহাদের মধ্যে এমনভাবে সংক্রমিত হইয়াছিল যে, ভিন্ন দেশের উন্নতিশীল নারীদের কর্ম্ম-পদ্ধতি দেখিয়া শুনিয়াও তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিল। মনে হইত, বিশ্ব-প্রগতির সঙ্গে বুঝি ইহাদের মোটেই পরিচয় নাই। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে কতকগুলি পুরাতন সংস্কারই যে তাহাদের এইরূপ মনোবৃত্তির স্রষ্টা তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাসমরের পূর্ব্বে ইরাকে নারী-সমাজে যেরূপ শিক্ষার প্রচলন ছিল তাহা একটা জাতির পক্ষে নিতান্ত নৈরাশ্য-জনক। তখন ধনিক শ্রেণীর কন্যাদের কেহ কেহ তাহাদের বর্ণমালার ক, খ, শেষ করিয়া শিক্ষা খতম করিয়া বসিত; কদাচিৎ দুই চার জন শিক্ষাপ্রয়াসী মেয়ে ফরাসী বা ইংরাজ মিশনারীদের স্কুলে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বালিকা-শিক্ষার প্রতি কেহ মনোযোগী ছিল না বলিলে হয়। নিম্নশ্রেণীর ও মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর নারী-সমাজের কথা না

তুলিলেই চলে, কারণ অশিক্ষার অন্ধকার তাহাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। নিজেদের স্বামী-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য জ্ঞান তাদের মোটেই ছিল না বলা যাইতে পারে। ইহারা ছিল শুধু প্রাচ্যের এক একটি স্বাভাবিক কল। গর্ভধারণ, সন্তান-পালন ও অবিন্যস্ত গৃহস্থালীর কার্য্য-সম্পাদন ছাড়া তাহাদের আর কোন কাজই ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তাহারা এ-সকল কার্য্যেও অপারগ হইত তাহা হইলে তাহাদের আর দুর্গতির সীমা থাকিত না। অকর্ম্মণ্য বলিয়া ইহারা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইত। ইরাকীরা তাহাদের নারীদিগকে কোন বিশেষ অধিকার দিত না। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ শুধু যৌন সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল। সত্যিকার সঙ্গী বা দরদী বলিয়া কেহ কাহাকেও মনে করিত না।

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহ মনে করিতেও পারে নাই যে, ইরাক হইতে এ-অন্ধতা দূরীভূত হইবে, ইরাক রমণীরা নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর হইতেই যেন কোন যাদুকরের সোণার কাঠির মোহন স্পর্শে ইরাকের এই রূপ ক্রমে বদলাইতে লাগিল। অমঙ্গলের মধ্য দিয়া মঙ্গলের আলোরেখা ইরাকের মস্তকে পতিত হইল। অবশ্য এই মঙ্গলের বার্ত্তাবাহী তুর্কীমেয়েরাই। মহাযুদ্ধের পর বহু ইরাকী অফিসার তুর্কীমেয়ে বিবাহ করেন। এই তুর্কীমেয়েদের অনেকেই আবার পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিতা। ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া বহু ইরাক রমণী নিজেদের সম্বন্ধে সজাগ হইতে শিখিলেন। এই জাগরণের ফল স্বরূপ কিছুকাল মধ্যে অন্যান্য দেশের সহিত নানাবিধ সম্বন্ধে ইরাক জড়ীভূত হয়। ট্রেণ, বিমানপোত, টেলিগ্রাম, মোটরকার, প্রভৃতি ইরাকে প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইরাক-রমণীরা বাহিরের আলো

বাতাসের সন্ধান পান। এই সময় হইতে ইরাকে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার আন্দোলন শুরু হয়। সমগ্র ইরাকের মধ্যে স্কুল-পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফরাসী ও আমেরিকান খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া শিক্ষার্থিনী-ইরাকী বালিকাগণের শিক্ষার প্রাথমিক সুযোগ দান করা হয়।

বাগদাদে বালিকাদিগের জন্য যখন প্রথম স্কুল খোলা হইল, তখন দলে দলে প্রৌঢ়া নারীরাও বালিকাদিগের সহিত মিশিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। বয়সের গুরুত্বের দিকে এই সকল সাহসী ও অধ্যবসায়ী রমণীর আদৌ দৃষ্টি ছিল না। অবশ্য এই সকল রমণীর অধিকাংশই উচ্চবংশীয়া ও উন্নত শ্রেণীর। এরা তলে তলে তুর্কী মেয়েদের নিকট হইতে এই শিক্ষার প্রেরণা লাভ করিতেছিলেন। ইরাকের নিম্নশ্রেণীর নারীদের মধ্যে অশিক্ষা এখনও আধিপত্য করিতেছে যথেষ্ট, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরে সাধারণভাবে ইরাক রমণীদের মধ্যে শিক্ষার আলোক ও আকাঙ্ক্ষা যেরূপভাবে ঢুকিয়াছে, তাহা খুবই আশাপ্রদ। ইরাকের, বিশেষ করিয়া বাগদাদের, যে-সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইরাক-রমণীগণকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেছে, বাগদাদের সেণ্ট্রাল গার্লস্ স্কুল ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজ তাহাদের অন্যতম। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মধারা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেবল শিক্ষাদানই ইহার কর্ত্তব্য নহে, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করাও ইহার অন্যতম কাজ। এবং এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের প্রচার ফলেই আজ ইরাকের যুব-সমাজের মধ্যে শিক্ষার বীজ সংক্রমিত হইতেছে। অশিক্ষার বিরুদ্ধে ইহারা যেন জেহাদ ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইরাকে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা

দিয়াছে। প্রায় পাঁচ বৎসর পুর্ব্বে বাগদাদের কয়েকজন মুসলিম নারী মিলিত হইয়া একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইরাকের দুর্দ্দশা-গ্রস্ত নারীদের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধন করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার পড়িয়াছিল বিখ্যাত ইরাক-কবি জমিল যাহাবির অবিবাহিতা ভগ্নীর উপর। এই বিদুষী মহিলা নানা ভাষায় সুপণ্ডিত; এবং নির্ম্মল চরিত্রের জন্য ইনি বাগদাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধা।

সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কিন্তু ইঁহারা বিশেষ কোন কাজ করিতে পারিলেন না। সমিতির কর্ম্মধারাও অনির্দ্দিষ্ট রহিল। মধ্যে মধ্যে নারীপ্রগতি সম্বন্ধে দুই চারিটি বক্তৃতার অনুষ্ঠান করিয়া ও সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াই সমিতির কাজ শেষ করা হইত। সদস্য সংগ্রহ সম্বন্ধে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম করা হয় নাই; উন্নতিকামী সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই সমিতিতে সাদরে আহ্বান করা হইত। যাহা হউক, কিছু না করিলেও সমিতির ছোটখাট কাজগুলি বেশ শান্তভাবেই সম্পাদিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এ ভাব বেশীদিন থাকিল না। সহস্র বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হইয়া কোন জাতিই উন্নতির পথে আগুয়ান হইতে পারে নাই, ইরাক রমণীরাই বা পারিবে কেন? শীঘ্রই ইরাকে নারী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বিরুদ্ধবাদীরা সংবাদপত্রে, আবেদন পত্রে, আরও নানাপ্রকারে এই আন্দোলনকে মুকুলে বিনাশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা শুরু করিয়া দিল। বিরুদ্ধবাদীদের মতে, "পর্দ্দা তুলিয়া দিয়া মুসলিম নারীরা ভীষণ পাপ করিতেছে; উচ্ছৃঙ্খল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়া মুসলিম সমাজকে বরবাদ করা হইতেছে।" এই সকল অভিযোগ অবশ্য অতিরঞ্জিত করিয়াই প্রচার

করা হইয়াছিল। কারণ তখনও পর্য্যন্ত কোন ইরাকী রমণী পর্দ্দা ত ত্যাগ করেই নাই, অধিকন্তু অধিকাংশই বোরকায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বাহিরে যাইত। পর্দ্দা-পরিত্যাগ করিবার কোন প্রশ্নই তখনও ইরাকের নারী-সমাজে উঠে নাই। যাহা হউক, বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগের উত্তরে এই সমিতি জানাইলেন যে "আমাদের উদ্দেশ্য কেবল অনাথা ইরাকী-বালিকাগণকে শিক্ষাদান করা ও ইহাদের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা।" এই উত্তরের পর হইতে ইরাক-সরকার সমিতির সম্বন্ধে আর কিছু গোলোযোগ সৃষ্টি করেন নাই। সুযোগ বুঝিয়া সমিতির সদস্যরা ইহাকে গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করিয়া লইলেন। এই সময় হইতে সমিতির নাম হইল "নারী প্রগতি সঙ্ঘ" (Club for the Elevation of Women). কিন্তু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে কি হয়, যদি দেশের জনগণের সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় না। জন-সাধারণের নিকট হইতে কোন প্রকার সহানুভূতি না পাইয়া এই সঙ্ঘের কাজ একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। প্রগতি-সঙ্ঘ অতঃপর চা-সঙ্ঘে পরিণত হইল।

প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ইরাকের নারী প্রগতি সঙ্ঘ একরূপ মরিয়া রহিল বলিলেও চলে। কিন্তু দুই বৎসর পর কোন এক দুরুজ-কুমারীর সোণার কাঠির মোহন স্পর্শে এই সঙ্ঘ পুনরায় প্রাণ পাইল। এই দুরুজ-কুমারীর নাম নূর হামাদি। ইনি সিরিয়ার মুসলিম নারী সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী। ইরাকের "নারীপ্রগতিসঙ্ঘের" প্রধানা কর্ত্রী এস্‌মা খানম যাহাবিকে ইনি এক পত্র দ্বারা জানান যে, ইরাকের নারী-প্রগতি-কামী মুসলিম রমণীরা যদি সিরিয়ার নারী সমিতির সহিত কাজ করেন. তাহা হইলে তাঁহারা বোধ হয় অচিরে দুনিয়ার উন্নতিশীল

নারী-সমাজের সহিত সমান তালে পা-ফেলিয়া চলিতে পারিবেন। তিনি ইহাও অনুরোধ করেন যে, যথাক্রমে মিসর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও ইরাকে মুসলিম নারী-সমিতির যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে ইরাকের নারীসঙ্ঘ হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে।

এস্‌মা খানম যাহাবিও কর্ম্মী মেয়ে। কাজের মত কাজ পাইলে তিনি আর কিছু চান না। নূর হামাদির পত্র তাঁহার অন্তরে দ্বিগুণ তেজে কর্ম্মস্পৃহা জাগাইয়া দিল। তিনি পুরাতন সদস্যগণকে লইয়া নূরীপাশা আস্‌-সাঈদের গৃহে এক জরুরী সভা করিলেন। বহু বক্তৃতা হইল, সংবাদপত্রে রিপোর্ট বাহির হইল, সম্পাদকীয় স্তম্ভে খুব বাহ্‌বা দেওয়া হইল। কর্ম্মীরা আবার নবীন উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলেন। সঙ্ঘ সঙ্কল্প করিল যে, এই সঙ্ঘের কাজ কেবল কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, সত্যিকারের কাজ কিছু করিতে হইবে। তবে পর্দ্দা সমস্যা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এখন হাত দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে। ওই দুইটি আন্দোলনের বাহিরে থাকিয়া এখন কাজ করিতে হইবে।

মিসরের নারী আন্দোলন যদিও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে আছে বলিয়া প্রচারিত হয়, তথাপি সঙ্ঘ-নেত্রীরা ভিতরে ভিতরে রাজনীতিকগণেরই হাতের পুতুল। এবং এই জন্যই বোধ হয় ইহার উন্নতির পথ রুদ্ধপ্রায়। সিরিয়ার নারী আন্দোলন যদিও এই দোষ হইতে মুক্ত, তথাপি ইহার অনেকেই আন্তর্জ্জাতিক নারী-আন্দোলনের সহিত মিতালী পাতাইতে রাজী নয়। ইহাও দোষের। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইরাক নারী-প্রগতি সঙ্ঘের নেত্রী এস্‌মা খানম যাহাবী স্থির করিলেন যে, প্রাচ্যের নারী-জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক নারী-সঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে; বিশেষ

করিয়া পাশ্চাত্যের উন্নতিশীল নারী সমাজের সহিত পরিচিত হইতে হইবে ও তাহাদের নিকট হইতে প্রেরণা লইতে হইবে। তাহাদের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। জাতি-বিদ্বেষ উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে, পক্ষান্তরে সহিষ্ণুতা ও প্রীতির দ্বারা ইংলণ্ড তথা পাশ্চাত্যের নিকট হইতে প্রেরণা লওয়া সহজ হইবে।

প্রগতির পথে ইরাক-রমণীগণ এতটা অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত ইরাকী পুরুষের নিকট হইতে তাহারা কোন সাহায্য পায় নাই। সঙ্ঘের গৃহ-নির্ম্মাণ ব্যাপারে কোনো ইরাকী-পুরুষ এক কপর্দ্দকও সাহায্য করে নাই। কেহই যে এই সঙ্ঘের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, তাহা নহে; তবে বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে তাঁহারা কিছু করিতে পারিতেন না। এই সময় নারী স্বাধীনতাকামী এক মহাপ্রাণ বাগদাদে আসেন। তাঁহার নাম জমিল বে বারহাম। বাগদাদের এক সভায় "ইসলামে নারীর অধিকার" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিবেন বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। ঘোষণায় দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। অনেকেই আপত্তি করিল। অবশেষে উদারচেতা একদল ইরাকী বলিলেন "একজন বিদেশী হিসাবে আপনি যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, কিন্তু ইরাকীরা এবিষয়ে কখনও কিছু বলিতে পারে না।" সভা হইল, কিন্তু কোন ইরাকী পুরুষকে সভায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সভাগৃহ ইরাকী মহিলায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে দিনের অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে ইরাকে পুরুষের আধিপত্যের বুঝি বা অবসান হয়।

মোটের উপর ইরাকের এই যে নারী-আন্দোলন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই যে সাধুপ্রচেষ্টা, ইহার ভিতরে কাজ করিতেছে কবি জমিল যাহাবীর প্রেরণা ও এসমা খানমের কর্ম্মশক্তি। সর্ব্বপ্রকার অনাচার

ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এ জেহাদ,—স্বার্থান্ধদের বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া নারীদিগকে ইসলাম নির্দ্দেশিত সত্যকার অধিকার প্রদানের জন্য এই প্রাণপণ সংগ্রাম—একদিন না একদিন বিজয়-সুষমামণ্ডিত হইবে। আর নারীপ্রগতির অগ্রদূত এস্‌মা খানমের নামও সেই সঙ্গে দুনিয়ার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠায় সুবর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া যাইবে।

নারী-সমস্যায় বেগম ইজ্জত পাশা

বেগম ফাতেমা শরীফা ইজ্জত পাশা নাম্নী জনৈকা আধুনিক আরব মহিলা কিছুকাল পুর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন। [এঁর পিতা মোহাম্মদ আবদুল্লা আবেদ ইজ্জত পাশা বর্ত্তমানে সিরিয়ার অর্থ-সচীব। ইনি পুর্ব্বে তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল হামিদের অধিনে কাজ করিতেন। ইনি ১৯০৬ সাল হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকায় তুরস্কের রাজদূত রূপে কাজ করিয়াছিলেন।] বোম্বাইয়ের জনৈক সংবাদ পত্র প্রতিনিধির নিকট বেগম ইজ্জত পাশা মুসলিম জগতের নারীপ্রগতির এক চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়াছেন।

সংবাদপত্র প্রতিনিধি বেগম ইজ্জত পাশা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আমি যখন তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে সাক্ষাত করিতে যাই তখন মনে করিতে করিতে গিয়াছিলাম যে, আরব মহিলাকে হয়ত বোরখা ও ঘোমটায় আবৃত একটী জড় পদার্থ রূপে দেখিতে পাইব। কিন্তু আমার সে ধারণা শীঘ্রই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি যখন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন তখন আমি তাঁহাকে আরব মহিলা বলিয়া মনে করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। ..যাহা হউক তিনি

আমাকে অত্যন্ত আধুনিক কায়দায় স্মিত মুখে অভিনন্দন করিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় জানিতে পারা গেল যে তিনি ইংরাজী, ফারসী প্রভৃতি ছয় রকম ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইংরাজী কাব্য ও সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ জ্ঞান আছে। এঁর বর্ত্তমান বয়স ৩১ বৎসর। বাল্যে ইনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

কথা প্রসঙ্গে বেগম ইজ্জত পাশা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বলেন, "মহাত্মাজীকে আমার দেশবাসী খুবই ভালবাসে। তিনি যখন গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় আমার পিতার পক্ষ হইতে আমি তাঁকে সিরিয়ায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি ভবিষ্যতে আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীকে আমি বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া মনে করি এবং শ্রদ্ধা করি। মহাত্মার নম্রতা, সহিষ্ণুতা, সাধুতা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মুসলমানের আসন দিয়াছে।"

মুসলিম জগতে নারী আন্দোলনের গতি সম্বন্ধে বেগম বলেন, কামালপাশার "এগিয়ে চলার" আদেশে তুর্কী মহিলারা আজ তাঁদের ইউরোপীয় ভগিনীদের সমান অধিকার লাভ করিয়াছেন। তুরস্কের পরই সিরিয়ার নারীরা প্রগতির পথে ধাবিত হইতেছে। গোঁড়া মৌলবীদের অত্যাচার যদি সিরিয়ায় আধিপত্য না করিত তাহা হইলে হয়ত তারা আরও অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিত। সিরিয়ার নারীদের মধ্যে ভাল বক্তা ও কর্ম্মীর অভাব নাই। কিন্তু সংস্কার-বিরোধীদের জন্য তারা নিজদের মতবাদ অকুণ্ঠিত ভাবে প্রচার করিতে অক্ষম।

এত বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও সিরিয়ার নারীদের মধ্যে কাজ যাহা

চলিতেছে তাহাতে আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে ইহারা তুর্কী মেয়েদের মতই অধিকার লাভে সমর্থা হইবে। আমার ভ্রাতা নাজিক মুস্তাফা পাশা আবেদ একজন জাতীয়তাবাদী। তিনি জাতি গঠন কার্য্যের অপরাধে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইনি সিরিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের কন্যাদের জন্য একটী প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। এখানে এই সকল মেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করা হয়। মাদাম শাহ বুলদার একজন রাজনীতিক। সিরিয়ার বহু সংবাদপত্রও নারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবিবা হাদ্দাদ, মরিয়ম আদজানি প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বদরা দামিস্কিয়া সিরিয়ার একজন বিখ্যাত রাজনীতিক এবং কবি। ওখানে যে পর্দ্দা-বিরোধী সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে আমার ভ্রাতা তাহার সভাপতি।

বেগম ইজ্জত পাশার দেশ যে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, প্রত্যেক দেশ তাহার কার্য্য ও ত্যাগের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করে।

বেগমের মাথায় চুল খাটো করিয়া কাটা (Bobbed hair) ছিল। তিনি বলেন এ ফ্যাসানটা সব চেয়ে চমৎকার। এতে মাথা পরিষ্কার ও হাল্কা থাকে।

স্বাধীন ভাবে ভালবাসায় (free love) তাঁর আস্থা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বেগম বলেন, উহাতে ফল ভালই হয়, কিন্তু ভালবাসা যেন একজনের উপরই সীমাবদ্ধ থাকে। বহু বিবাহ ইসলামের উপর একটা কলঙ্করেখা। আমি আশা করি তুরস্কের মত সমস্ত মুসলিম জগতে ইহা শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে।

আফগান নারী

আফগান জাতির ইতিহাস রহস্যপূর্ণ, তারা সামরিক জাতি—সতত বিদ্রোহী। কিন্তু আফগানিস্তানের নারীরা পুরাতন সমাজ বিধানের বিরুদ্ধে কতটা বিদ্রোহী হইয়াছে তাহা বড় বেশী জানা যায় নাই। আফগান নারীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানাও খুব সহজ নহে। তবে এ-টুকু জানা যায় যে, পর্দ্দা-প্রথার অত্যন্ত কড়াকড়ি থাকার জন্য কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আফগান নারীরা শিক্ষার বিশেষ সুযোগ পান নাই। তবে ভূতপূর্ব্ব আফগান রাজ আমানুল্লার পিতা আমীর হবিবুল্লার রাজত্বকালে আফগানিস্তানের নারী সমাজে একটু শিক্ষার আলোকচ্ছটা পড়িয়াছিল। তিনি নিজ হাতেই ইউরোপীয় ভাবধারা আমদানী করিয়াছিলেন। নারীদের শিক্ষার জন্য তিনি সে সময় যাহা করা সম্ভবপর তাহা করিয়াছিলেন। নারী শিক্ষার নামে আফগান সমাজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। ধর্ম্মান্ধ সমাজের ধ্বংশকারী যদি কিছু দুনিয়ায় থাকে তবে তাহা এই স্ত্রী-শিক্ষা, এই ছিল তাদের ধারণা। কাজেই আমীর হবিবুল্লা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সে সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়াই করিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি ব্যগ্রতা দেখাইয়া সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া নিজের ধ্বংশ ডাকিয়া আনেন নাই।

আমীর হবিবুল্লার পর আসিল বাদশাহ আমানুল্লার শাসন কাল। তরুণ রাজা আমানুল্লাহ্‌র প্রাণে আফগানিস্তানের আঁধার অন্তপুর

দারুণ বেদনা হানিল। তিনি প্রাণপণ করিলেন, আফগান নারী দিগকে শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বলতর করিবার জন্য। আমীর হবিবুল্লা ক্ষেত্র তৈয়ারী করিয়া গিয়াছিলেন, কাজেই আমানুল্লার অল্প চেষ্টাতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হইল। আফগান নারী-সমাজ অতি অল্পকাল মধ্যে শিক্ষালাভের জন্য পণ করিল।

বাদশাহ আমানুল্লাহ্ কাবুলে বহুসংখ্যক স্কুল ও কয়েকটী কলেজ স্থাপন করিলেন। আফগান বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য সমান ব্যবস্থা করা হইল। অতি অল্পদিন মধ্যেই বহুসংখ্যক আফগান বালিকাকে শিক্ষালাভের জন্য ফ্রান্স ও তুরস্কে পাঠান হইল। তাঁহারা অবরোধের বালাই ছাড়িলেন। খাঁটী ইউরোপীয় ধরণে সজ্জিত হইয়া বিদেশের পথে পাড়ি দিলেন।

আফগানিস্তানের তরুণীরা যখন ইউরোপীয় পোষাকে ঘোমটা খুলিয়া, বই-কেতাব বোঝাই ছোট হাতবাক্স হাতে ঝুলাইয়া স্কুলের পথে সারি বাঁধিয়া চলিত, তখনকার দৃশ্য দেখিলে কোন দেশ হিতৈষীই আফগান-রাজ আমানুল্লাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেন না।

বাদশাহ আমানুল্লার রাজধানী দারুল আমানে একটী সরকারী বাগান ছিল। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় আফগান নারীরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন সহ প্রকাশ্যভাবে বেড়াইতেন।

সোহ্‌রাব কে, এইচ, কাতরাক নামক জনৈক পার্শী ভদ্রলোক তাঁর Through Amanullah's Afghanistan নামক গ্রন্থে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে সেখানকার নারীদের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ঃ—

"কাবুল রাজ আমানউল্লার গ্রীষ্মাবাস পাঘমান। প্রকৃতি সুন্দরীর লীলাভূমি পাঘমান। আফগানিস্তানের স্বাধীনতা উৎসবের দিন

এই পাঘমানের সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমাদের মোটর যতই পাঘমানের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই আমরা অধিকতর ঠাণ্ডা বোধ করিতে লাগিলাম। আমাদের মনে হইতে লাগিল, যেন আমরা ইউরোপের কোন প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি।

......স্বাধীনতা উৎসবের মিছিল বাহির হইল। দলে দলে আফগান তরুণীরা আধুনিক ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত হইয়া হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে ছুটাইতে রাস্তা দিয়া মিছিল করিয়া যাইতে লাগিল। নব-প্রাপ্ত স্বাধীনতা যেন তাহারা পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করিতেছে, এরূপ বোধ হইল। এই তরুণীদলের কাহাকেও আবার পাতলা ঘোমটা ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছিল। তবে সকলেরই পরিধানে ছিল ইউরোপীয় পোষাক। ....

এই উপলক্ষে আতসবাজীর প্রদর্শণী হইয়াছিল। বহুসংখ্যক আফগান রমণী ছিলেন এই প্রদর্শনীর দর্শক। যখন প্রদর্শনী ভাঙ্গিয়া গেল তখন মহিলারা বাহির হইয়া যাইবার জন্য ভীড় বাধাইলেন। নারী-পুরুষের ভীড়ে প্রদর্শনীর অল্প-পরিসর পথ বন্ধ হইয়া গেল। এমন সময় একজন আফগান সৈনিক "মহিলাদের পথ ছাড়িয়া দিন" বলিয়া ভীড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। অমনি যাদু-মন্ত্রের মত সমস্ত পুরুষ রাস্তার দুই পাশে সরিয়া গিয়া মহিলাদের জন্য পথ করিয়া দিল। আমি আফগান জন-সাধারণের নিকট এতটা ভদ্রতা ও নম্রতা প্রত্যাশা করি নাই। নারী জাতির প্রতি তাদের এ সম্মান খুবই আশার কথা।

আফগান রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন কয়েকটী টেনিস খেলার জায়গা আছে। তাহাতে আফগান রাজ অন্তঃপুরের তরুণীরা টেনিস খেলেন। রাজা আমানুল্লাহ ও রাণী সুরাইয়া এখানে টেনিস খেলিতেন।"

* * *

ভূতপূর্ব্ব আফগানরাজ

ভূতপূর্ব্ব আফগান রাণী
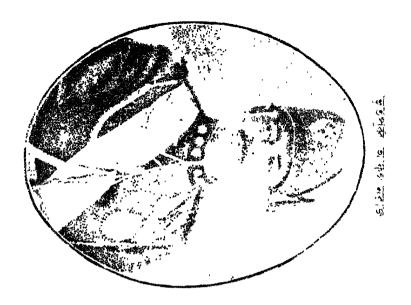
তুর্কি মহিলা মাদাম নাসিয়াহ্‌ হালিদ খুরশিদ বে ১৯২৮ সালে সংবাদপত্রে এক বর্ণনা দিয়াছিলেন। ইনি রাণী সুরাইয়ার সহচরী ছিলেন। সপারিষদ আমানুল্লাহ যখন য়ুরোপ-ভ্রমণে গমন করেন, তখন ইনি রাজ পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। ইনি লিখিয়াছেন ঃ—

"রাজা আমানুল্লাহ রাজ্যমধ্যে বহু ক্রমোন্নতিশীল সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্কারের অধিকাংশের বিবরণ পাশ্চাত্য জগতের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার প্রজাদের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হইয়াছিল। তথাপি তাহাও তাহারা সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু একদিন আফগানদিগের রাণী সৌরিয়া একটি শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহন করিয়া কাবুলের রাজপথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। ঘোড়ায় চড়িয়া প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে দেখিয়া প্রজারা ক্ষেপিয়া গেল। ইহা আর তাহাদের সহ্য হইল না—ইহাই শেষ তৃণের কার্য্য করিল। তখন মোল্লা আল্লার নিকট তাহার নালিশ রুজু করিল, বন্দুক ঘাড়ে তুলিয়া লইল। ফলে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। খাইবার গিরি সঙ্কটের অপর পার্শ্বে রক্তনদী প্রবাহিত হইল।

একদিন কনষ্টান্টিনোপলস্থিত আফগান বাণিজ্যদূত একজন উচ্চপদস্থ তুর্ক সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তাঁহার উপর এই আদেশ হইয়াছে যে, প্রতীচ্য ভাবে শিক্ষিতা, উচ্চপদস্থা একজন তুর্কী মহিলাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তিনি আফগান রাণী সৌরিয়ার সহচরী হইবেন। আফগান দূত স্বয়ং এমন কোন তুর্ক মহিলাকে চিনেন না, সেই জন্য তিনি তুর্ক রাজকর্ম্মচারীর নিকট আসিয়াছেন—যদি তাঁহার সাহায্যে এইরূপ কোন মহিলার সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত তুর্ক কর্ম্মচারী এই পদের জন্য আমাকে (অর্থাৎ

লেখিকাকে) নির্ব্বাচন করেন। এইরূপে আমি আফগান রাণীর সহচরী হইলাম। এই কার্য্যটি আমার বেশ মনের মতন হইল।

কার্য্যকালে আমি রাণীর পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি প্রিয়ভাষিণী উচ্চশিক্ষিতা সহৃদয়া রমণী। রাজার সকল প্রকার সংস্কারের তিনি অনুমোদন করিতেন। কোন প্রকার সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র তিনি সর্ব্বাগ্রে যতশীঘ্র সম্ভব রাজদরবারে প্রচলন করিতেন। প্রজার মঙ্গল-সাধনের দিকে রাজার প্রখর দৃষ্টি ছিল। আফগানিস্তানকে সভ্য জগতের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না।

রাজা আমানুল্লা প্রজাদের মধ্যে এমন কোন সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন নাই, যাহা তিনি স্বয়ং অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার প্রথম সংস্কার—বহু বিবাহ নিবারণ। তাঁহার পিতার একাধিক পত্নী ছিল। এই সপত্নীরা তাঁহাকে যতটা বিব্রত করিত, আর কোনও মানুষ তাহা করিতে পারে নাই। বিমাতাগণের আচরণ দৃষ্টে রাজা আমানুল্লা স্থির করিলেন একজন মানুষের পক্ষে একটি পত্নীই যথেষ্ট। সেই জন্য তিনি একটিমাত্র বিবাহ করেন। তাঁহার একটি পুত্র আছে, তাহার বয়স ১৮ বৎসর। এই ভাবে কিছুদিন গেল, কোন গোলযোগ হইল না। অবশেষে আমানুল্লা সৌরিয়াকে তাঁহার ভ্রাতার গৃহে দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি প্রথমা পত্নীকে তালাক দিয়া সৌরিয়াকে বিবাহ করিলেন। সৌরিয়ার গর্ভে তাঁহার ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বিপ্লব আরম্ভ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে আমানুল্লাহ প্রজাগণের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিবার জন্য রাজ্যের সুদূরবর্ত্তী অংশগুলিতেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং বক্তৃতা করিয়া তাহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজার এই ভ্রমণকালে রাণী সৌরিয়া এবং তাঁহার ভগিনী

রাজার সঙ্গে থাকিতেন। সকলেই অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন; অশ্বপৃষ্ঠে উচ্চ পর্ব্বত ও তুষারাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করিতেন। এইরূপে বহু নগর পরিদর্শন করা হইয়াছিল। নানাস্থানে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত, তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইত, এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইত। অনেক সময়ে জনপ্রতিনিধিরা অনেক বিচিত্র ও অসঙ্গত অনুরোধও করিত।

এক সময়ে একটা প্রশ্ন উঠিল—স্ত্রীলোকেরা এতবেশী পরিমাণে নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ রাজা পরামর্শ দেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা দাও—তাহাদিগকে কঠোর অবরোধে রাখিও না। স্ত্রীলোক যদি নিজের গৃহে সুখে থাকিতে পারে, সে গৃহত্যাগ করিবে কেন।

রাজা আমানুল্লা ও রাণী সৌরিয়া প্রজারঞ্জনে সমর্থ হয়েন নাই বটে, কিন্তু প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তাহাদের মঙ্গল, তাহাদের স্বাধীনতা তাঁহাদের একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল। পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতিসমূহের রাজ্যগুলির মানচিত্রের মধ্যে আফগানিস্তানকে স্থাপন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে তাঁহাদের নিজেদের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহা অতি তুচ্ছ, নগণ্য বিষয়। আফগান জাতি ও আফগানিস্তানের জন্যই তাঁহাদের যত চেষ্টা, যত পরিশ্রম, যত কল্পনা। পৃথিবীর প্রগতির ইতিহাসে এইরূপ প্রচেষ্টা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

হ্রস্ব পরিচ্ছদ, অশ্বারোহণে রাণীর প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ—ইহা তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার সামান্য অংশ মাত্র। এই সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে নাই পারুন, তাঁহাদের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না।"

বাদশাহ্ আমানুল্লার পরও আফগানিস্তানের নারী-আন্দোলন সমান ভাবে চলিতেছে। বাদশাহ্ নাদির খাঁ যদিও দ্রুত সংস্কার কামী নন, তবুও ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া তিনি নারী আন্দোলনের বিরোধী হইতে পারেন না। আফগান বালিকাদের শিক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন। তাহা ছাড়া বাদশাহ্ আমানুল্লাহ ও রাণী সুরাইয়া আফগান নারী মহলে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বালাইয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে নিভিবার নয়। ইহার সুফল বহুযুগ ধরিয়া আফগান নারী-সমাজ ভোগ করিবে—তাহাদিগকে মুক্তি-পথের সন্ধান বলিয়া দিবে।

*　　*　　*　　*

সৈয়দ কাসেম খান প্রায় দুই বৎসর কাল ভারতে আফগান কন্সাল ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালে স্বদেশ হইতে যখন দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন সংবাদপত্রের জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার নিকটে সৈয়দ কাসেম খান আফগান নারীদের সম্বন্ধে বলেন—

"আফগান নারীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক আফগান নারী নিজেদের মুক্তি সাধন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে আদর্শ মাতা ও আদর্শ পত্নী হইবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আফগান নারীগণ আজকাল সমাজের কাজে যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা "আঞ্জুমানে হেমায়েত-ই-নিওয়ান" নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।"

বহু বিবাহ ও পর্দ্দা সম্পর্কে তিনি বলেন—"আফগান শাহ্ এক আদেশ প্রচার দ্বারা রাজকর্ম্মচারীদের কেহ একাধিক বিবাহ করিতে

পারিবেন না বলিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। পর্দ্দাপ্রথা উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই পূর্ব্বে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তাঁহারাও উহা পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহারা এক্ষণে ঘোমটা ব্যতিরেকে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে কোন বাধ্যতামুলক আইন হয় নাই বলিয়া এখনো বহু নারী ঘোমটা ব্যবহার করেন। বহুসংখ্যক আফগান নারী আজকাল কলকারখানার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।"

নারী সমস্যায় বেগম সুরাইয়া

বর্ত্তমান যুগের নারী আন্দোলন ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধী কি না, ইহা লইয়া অনেকে অনেক রকম মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভূতপূর্ব্ব আফগান রাজ-মহিষী বেগম সুরাইয়ার অভিমত জানিতে পারা গিয়াছে। আমানুল্লার সিংহাসন ত্যাগের পূর্ব্বে "হুহুনলু" নামক সাময়িক পত্রের একজন প্রতিনিধি মহামান্য বেগমের সহিত সাক্ষাত করিবার অনুমতি পান। বেগম প্রায় ২০ মিনিট কাল তাঁহার সহিত নারী-আন্দোলন ও ইসলাম সম্বন্ধে আলাপ করেন। একজন তুর্কী মহিলা দো-ভাষীর কাজ করিয়াছিলেন।

"হুহুনলু" প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করেন—ইসলামে নারীর সমস্ত অধিকার রক্ষিত হইয়াছে কি?

উত্তরে বেগম সুরাইয়া বলেন, প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় দেশের পণ্ডিতেরাই সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রার প্রণালী নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ইস্‌লামের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইস্‌লামের

নীতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ কাজে লাগাইতেছে না, এইজন্য অমুসলমানেরা মনে করিতেছেন যে, ইসলাম নারীদের সম্বন্ধে অনুদার ও নিষ্ঠুর। কিন্তু প্রকৃত কথা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলি আলোচনা করিলে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নারীজগতকে যে সকল অধিকার দিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনো ধর্ম্মই তাহা দেয় নাই। বাস্তবিক ইস্‌লামে দুই একটি বিষয় ছাড়া আর সকল বিষয়েই নারীকে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপের নারীরা বিংশ-শতাব্দীতে নানারূপ শিক্ষা ও সুযোগ পাইয়া অনেকখানি উন্নত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাচীন ইসলামী যুগে নারীরা যে অভুতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান উন্নতির তুলনাই হয় না। ইসলাম নারীকে চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, কার্য্যের স্বাধীনতা দিয়াছে; ইসলামই নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দান করিয়াছে; ইসলামই রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র-শাসন বিষয়ে নারীকে পুরুষের সহিত একাসনে বসাইয়াছে। ইউরোপের নারীরা ভোটের অধিকার পাইবার জন্য বর্ত্তমান যুগে ভীষণ আন্দোলন করিতেছেন।

কিন্তু তের বৎসর পূর্ব্বে "বায়াত" প্রণালীতে লোক সাধারণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে মুসলিম নারীরা এ অধিকার ভোগ করিতেছিলেন। আমি ইসলাম ও নারীজাতি সম্বন্ধে একখানি ছোট বই লিখিয়াছি। ইহাতে ইস্‌লামে নারীর স্থান ও অধিকার নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার বিশ্বাস এই বইখানি পাঠ করিলে ইসলাম সম্বন্ধে এখন যে সব ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে, তাহা চলিয়া যাইবে। আমার বইখানি ফারসীতে লেখা; আমি ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদের ব্যবস্থা করিয়াছি।

"হুহুনলু"র প্রতিধ্বনি অতঃপর 'হিজাব' বা পর্দ্দা সম্বন্ধে বেগম্ সুরাইয়ার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন।

বেগম বলেন, অনেক সময় দেখা যায় যে এক একটী প্রথা কিছুদিন ধরিয়া সমাজে চলিতে চলিতে শেষে কতকটা বাধ্যতামূলক হইয়া পড়ে—এমন কি ধর্ম্মবিধানের রূপ ধারণ করে। পর্দ্দা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। পর্দ্দা প্রথমে একটা সামাজিক প্রথা মাত্র ছিল; কিন্তু এখন সাধারণ লোকেরা মনে করে যে ইহা ধর্ম্মের একটী অঙ্গ। কোরাণে পর্দ্দা সম্বন্ধে যতটুকু বলা হইয়াছে, সে কেবল সভ্যতা ও নৈতিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। ইসলামধর্ম্মে কোথাও এমন কথা নাই যে এই নিয়মগুলি কেহ মানিয়া না চলিলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া কোরাণে যে কেবল নারীকেই পর্দ্দা রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, এমন নহে। বরং পুরুষের জন্যও পর্দ্দা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইস্লামের বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকেরা হাত, পা ও মুখ ভিন্ন দেহের অন্যান্য অংশ আবৃত রাখিবেন। নামাজ ও হজের সময় এরূপ পর্দ্দা বিশেষ আবশ্যক। এই ধরণের নিয়ম শুধু স্ত্রীদের জন্য নয়, বরং পুরুষের জন্যও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এরূপ পর্দ্দা যে ইসলামই প্রথম সৃষ্টি কারয়াছে, তাহা নয়। ইসলামের পূর্ব্বে জগতে আর যে সকল বিশ্বধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহাতেও এরূপ পর্দ্দা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। ইসলামের প্রারম্ভযুগে নারীরা পুরুষের পার্শ্বে থাকিয়া কাজ করিতে পারিতেন। তাঁহারা পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতেন, আহত ও পীড়িত সৈন্যদের সেবাশুশ্রূষা করিতেন, যুদ্ধের সময় যোদ্ধ-গণকে জাতীয় বীরত্বগাথা গাহিয়া উৎসাহিত করিতেন এবং কেহ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে তাহাকে তিরস্কার ও বাধা প্রদান করিতেন। বর্ত্তমানে যেরূপ পর্দ্দা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে থাকিয়া এ-সব

কাজ কখনই সম্ভব নহে। এ-যুগে প্রতীচ্যের খৃষ্টান নারীরা এই যে নানা ভাবে দেশ ও জাতির সেবা করিতেছেন, প্রাচীন ইসলামী রীতিতেই ইহার মূল সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ-ছাড়া আমরা পয়গম্বর-পত্নী বিবি আয়েশা (রাঃ) ও পয়গম্বর-দুহিতা বিবি ফাতেমার (রাঃ) জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়াও আমাদের ধর্ম্ম-বিহিত পর্দ্দার স্বরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারি। তথাকার সমাজের প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে ছিল, মসজিদে যাওয়া (বিশেষ করিয়া ঈদের দিনে) হজের সময় কা'বা গৃহের চতুর্দ্দিকে সমবেত হওয়া, যুদ্ধে গমন করা এবং খলিফা নির্ব্বাচন করা। ইহার প্রত্যেকটী কার্য্যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় যোগদান করিতেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সে-কালে হাত, পা ও মুখ বাদ দিয়া দেহের অন্যান্য অংশ আবৃত করা ছাড়া অন্য কোনরূপ পর্দ্দা প্রচলিত ছিল না। আজকাল দুই একটী বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকদের মধ্যে—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে—যে-রূপ পর্দ্দার প্রচলন দেখা যায়, সে-কালের পর্দ্দা মোটেই সে-রকম ছিল না।

ইহার পর "হহুনলুর" প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন—তাহা হইলে বর্ত্তমান পর্দ্দার সৃষ্টি কখন হইল ?

বেগম সুরাইয়া উত্তরে বলেন, ইতিহাসে দেখা যায় ইসলামের বহু পূর্ব্বে কয়েকটী দেশ ও জাতির রাজপরিবারে ও বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকদের মধ্যে "হিজাব" বা পর্দ্দার প্রচলন ছিল। তওরিত ও জব্বুর (Old Testament) কেতাবে আমরা দেখিতে পাই যে, হজরত ইবরাহিমের (Abraham) যুগে পর্দ্দার ব্যবহার ছিল। প্রাচীন পারস্যের রাজারা ও মিসরের ফেরাউনরা (Pharaohs)) কঠোর পর্দ্দা মানিয়া চলিতেন। বর্ত্তমানের পর্দ্দা আব্বাসবংশীয় খলিফাদের

সময়েই সৃষ্ট হয়। পারস্যের সভ্যতা তাঁহাদের উপর অনেকখানি আধিপত্য বিস্তার করাতেই তাঁহাদের মধ্যে পর্দ্দা-প্রথা প্রবেশ করিয়াছিল। স্পেনের ওম্মিয়া বংশের খলিফাদের অধিকারে এরূপ পর্দ্দা ছিল না। তাঁহাদের সময় মহিলারা প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন। মোটকথা পর্দ্দা সম্বন্ধে একটা বিষয় বেশ ভালরূপ বিবেচনা করা উচিত। মুসলমানদের মধ্যে যতগুলি কাজ পাপজনক বলিয়া ধরা হয়, তাহার প্রত্যেকটীর জন্য এক একটী শাস্তি—তা সে দৈহিক হোক আর আর্থিকই হোক—নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু কোনো স্ত্রীলোক পর্দ্দা ভঙ্গ করিলে তাহার জন্য কোনো প্রকার শাস্তির উল্লেখ দেখা যায় না। এ জন্য মনে করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান কালের পর্দ্দা জিনিষটা ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। কোনো স্ত্রীলোক পর্দ্দা রক্ষা না করায় তিরস্কৃত বা দণ্ডিত হইয়াছে এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে? হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনকালে, কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে কিংবা অন্য কোন মুসলিম বাদশাহের আমলে কখনও কোন প্রচারকই নগরে নগরে বা গ্রামে গ্রামে এরূপ ঘোষণা করা দরকার মনে করেন নাই যে, নারী-ভৃত্য বা নারী-শ্রমিক ঘোমটা খুলিলে সে আইন কানুনের বিরুদ্ধচারিণী হইবে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানেই বা আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণী ভিন্ন অন্য কেহই কঠোর পর্দ্দা মানিতেছেন না! এমনকি যাঁহারা মানেন, তাঁহারাও নওকর-চাকরদের সম্মুখে পর্দ্দা মানেন না, কেবল সমশ্রেণীর লোকদের অথবা পরিচিত লোকদের বেলাতেই মানেন।

বেগম সুরাইয়া আরও বলেন, ইসলামী পর্দ্দা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা সকলের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা দরকার। যদি পর্দ্দা সম্বন্ধে বর্ত্তমান গোঁড়ামী চিরকাল চলিতে থাকে তাহা হইলে প্রাচ্যের মুসলিম

নারীসমাজ কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। মানুষের সভ্যতা গঠনে নারী প্রচেষ্টার দাম বড় অল্প নয়। কিন্তু আমি একথা জোরের সহিত বলিতে পারি যে, প্রাচ্যের নারীকে যদি আধুনিক ধরণে সুশিক্ষিত করা না হয়, তাহা হইলে প্রাচ্যের পুনর্গঠনে নারী কিছুই সাহায্য করিতে পারিবে না। যাঁহারা সঙ্কীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়া বলেন যে, পর্দ্দার আড়ালেও স্ত্রীলোকদের শিক্ষা হইতে পারে, তাঁহারা "শিক্ষা" শব্দটীর অর্থই ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। শুধু লিখিতে শিখিলে ও পড়িতে শিখিলে শিক্ষালাভ হয় না। শিক্ষার অর্থ ইহার চেয়ে ঢের বেশী ব্যাপকতর। গ্রন্থ পাঠ, পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও তজ্জনিত যে অভিজ্ঞতা মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মকে একটা মহত্তর, একটা সুন্দরতর রূপ দান করে, তাহারই নাম শিক্ষা। পর্দ্দার আড়ালে এ শিক্ষা সম্ভব নয়। যাহা হোক, প্রাচ্য জাতিগুলির কল্যাণের জন্য আমি তাহাদিগকে এই উপদেশ দিই যে, তাহারা পর্দ্দা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণাগুলি পরিত্যাগ করিয়া ইসলামে যতটুকু পর্দ্দার ব্যবস্থা আছে, নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ তদনুযায়ী কাঁটছাঁট করিয়া লউন। নয়ত অনুকরণপ্রিয় প্রাচ্য দেশীয়েরা হুবহু ইউরোপের ফ্যাশন নকল করিবে এবং তাহার ফলে পর্দ্দা এমন সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইবে যে সাজ-পোষাকে আর ইসলামের নাম গন্ধও থাকিবে না।

আহমদ সা'দ জগলুল

মুক্তি আন্দোলনে মিসর-নারী

জগতের অন্যান্য দেশের নারীদের ন্যায় মিসরের নারীদের মধ্যেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সেখানে বেশ প্রবল ভাবে নারী-আন্দোলন চলিতেছে। সে দেশে অবশ্য ভারতের মত অবরোধ প্রথা নাই; নারীকে সেখানে খাঁচার পাখীরূপে পুষিবার জন্য কোন প্রয়াস নাই। বরং তদ্দেশে নারীরা যথাবিহিত পর্দ্দা করিয়া বাড়ীর বাহিরেও সর্ব্বত্রে গমনাগমন করিতে পারেন। কিন্তু নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক অন্যান্য অধিকার এখনো মিসরে তুরস্কের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এই জন্য সেখানে নারী-আন্দোলন বেশ জোরের সহিতই চলিতেছে। কুমারী জাকিয়া জোলেখা সোলেমান নাম্নী একজন মিসরী মহিলা কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। এ দেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা কিরূপ, এখানে স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ পদ্ধতিতে প্রদত্ত হয়, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এই বিদূষী মহিলা সুদূর মিসর হইতে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ কালে কুমারী জোলেখা সর্ব্বত্রই সমাদৃত ও তাঁহার জ্ঞানবত্তার জন্য প্রশংসিত হইয়াছিলেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য যে দেশ হইতে নারী পরিব্রাজক সুদূর দেশে আসিতে পারে, সে দেশের নারী-আন্দোলনের প্রাবল্য অনুমান করিয়া লওয়া কষ্টকর নহে। মিসরে বর্ত্তমানে পত্রিকা-সম্পাদক ও রাজকর্ম্মচারী-নারীর অভাব নাই।

মিসরের একজন মহিলা যিনি রাজনীতির সম্পর্কে আসিয়া রাজনীতিকে মাতৃহৃদয়ের স্পর্শ দিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছেন তাঁহার নাম এখানে না করিলে মিসরের নারীদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হইবে না। ইনি মিসরের মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা মহামানব জগলুল পাশার সহধর্ম্মিণী। ইনি স্বামীবিয়োগের পর স্বামীর পরিত্যক্ত নেতৃত্বের দুঃসহ ভার অম্লান বদনে নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লন। জগলুলের মৃত্যুর পর মিসরী যুবকগণ ম্যাদাম জগলুলের মধ্যে একটী অসাধারণ শক্তির ও মৃত নেতার প্রতাক প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তাই তাহারা মিসর-মণি জগলুলের পরিত্যক্ত নেতৃত্বভার জোর করিয়াই মাদাম জগলুলের উপর চাপাইল। তিনি দেশবাসীর অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। একদিন এক সভায় ম্যাদাম জগলুল বলিয়াছিলেন ঃ—তিনি নিঃসন্তান, দেশ-জননীর আহ্বানে, তাঁহার দুঃখ রহিয়া গেল যে, তিনি আপনার সন্তানকে পাঠাইতে পারিলেন না। অমনি সভার চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ জাগিয়া উঠিল, "কে বলে আপনি নিঃসন্তান, আমরা সকলেই আপনার সন্তান।"

ম্যাদাম জগলুলের তেজস্বিতা

মিসরের প্রধান মন্ত্রী সিদকী পাশা কিছুকাল পূর্ব্বে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তিনি জগলুল পাশার বাসভবন "হাউস অব দি নেশন" বন্ধ করিয়া দিবেন। এ সম্পর্কে ম্যাদাম জগলুলের নিকট এক-খানা পরোয়ানাও প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি এই পরোয়ানার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা স্থানীয় সংবাদপত্রে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

মিসরের বিদূষী মহিলা

কুমারী জাকিয়া জোলেখা সোলায়মান

"আপনার পরোয়ানার প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। ঐ পরোয়ানায় আপনি 'হাউস অব দি নেশন' এবং জগলুল পাশার পত্নীর বাসভবনকে "সাধারণের গতাগম্যের স্থান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আপনি ঐ বাড়ী সম্পর্কে "সাধারণের গতাগম্যের স্থান" বিষয়ক আইন প্রয়োগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। বোধ হয় লজ্জার খাতিরেই বলিতে পারেন নাই যে, ঐ স্থানটি "বিপজ্জনক এবং শৃঙ্খলার বিরোধী।"

আপনি এই বাড়ীর পবিত্রতায় আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। আপনার পূর্ব্বে কেহ এইরূপ কার্য্য করিতে সাহস পান নাই। আপনার এই ব্যবহারে আমি ব্যথিতা হইয়াছি বটে, কিন্তু বিস্মিতা হই নাই। কারণ ইতিপূর্ব্বেও আর একবার আপনি এই গৃহের পবিত্রতা সম্বন্ধে যে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা আরও সাংঘাতিক। জগলুলের অবিনশ্বর স্মৃতি যাহাদের পথ-প্রদর্শক তাহাদের সহিত সংগ্রামে সমর্থ না হইয়া আপনি জগলুলের সমাধি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন—মৃতের প্রতি এইরূপ শত্রুতা পোষণ আপনার অবনতিরই পরিণাম।

এই গৃহের গৃহকর্ত্তা আজ বর্ত্তমান নাই, গৃহকর্ত্তার বিরুদ্ধে আপনার যে আক্রোশ তাহা আপনি তাঁহার পত্নীর উপর মিটাইতে চাহেন। আপনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমি শুধু এক মহদ্ব্যক্তির পত্নীই নহি, খোদার আশীর্ব্বাদে আমি একটী মহাজাতির জননী। আমার এই সন্তানবৃন্দ আমার প্রতি অকপট স্নেহপরায়ণ, তাহারা যোদ্ধাও বটে।

জনাব, দেশের সন্তানদের নিকট আপনি যে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন সেই গৃহ আমার নহে, সেই গৃহ সমগ্র জাতির—যে দিন জগলুল দেশের সন্তানগণকে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন সেই দিন এদেশে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রভাতের

সূচনা হইয়াছিল এই গৃহেই—মিসরের তথা প্রাচ্যের স্বাধীনতা আন্দোলনের শৈশব দোলা দুলিয়াছিল এই গৃহেই। এই গৃহ আজ মিসরীদের পক্ষে, তথা প্রাচ্যের লোকের পক্ষে একটা তীর্থ স্বরূপ। এই তীর্থে আসিয়া তাহারা জগলুলের আত্মার নিকট হইতে এবং যাহারা জাতীয় আন্দোলনের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাদের আত্মার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ লাভ করে, ত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের অনুপ্রেরণা লাভ করে, সংগ্রামে অধ্যবসায় শিক্ষা করে।

এ সমস্ত কথা যদি আপনার নিকট অনর্থক মনে হয়, তবে জনাব, অন্ততঃ এ কথা স্মরণ রাখিবেন যে, মিসরের কোন মন্ত্রিমণ্ডলই ইতিপূর্ব্বে এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই! এমন কি আমি যতদিন মিসরে ছিলাম ততদিন পর্য্যন্ত বৃটীশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষও এরূপ চেষ্টা হইতে বিরত ছিলেন—আমি যখন স্বামীর নির্ব্বাসন সঙ্গিনী হইবার জন্য জিব্রাল্টারে গিয়াছিলাম একমাত্র তখনই তাঁহারা এই গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সমস্ত কথা জনাবের স্মরণ রাখা ভাল।

আপনার পরোয়ানায় আপনি যে কারণ ও ওজুহাত দেখাইয়াছেন তাহার উৎকৃষ্টতম উত্তর এই যে, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল কার্য্যভার গ্রহণের পর এ পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। এই গৃহ এবং এই গৃহাভিমুখী সমস্ত পথে সর্ব্বদা সতর্ক সশস্ত্র প্রহরী রাখিয়াছেন—এখানে যে সমস্ত আন্দোলন হয় বলিয়া আপনি অভিযোগ করিয়াছেন তাহা কখন এবং কি ভাবে হয়? এই গৃহে যদি বে-আইনী কার্য্য হয়ই তাহা হইলে আপনার মন্ত্রীমণ্ডল দুই বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে নীরব কেন?

আমার নিজ গৃহে আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাতে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের কতটা সম্মতি আছে তাহা জানি না। আমার স্বামী ১৯১৮

খৃষ্টাব্দে ওয়াফদ দল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমিও সেই দলের—তাঁহারই পুত্রগণ এবং উত্তরাধিকারিগণের সহিত আমি ঐ দলের পতাকা বহন করিয়া দেশকে দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি ও পূর্ণ স্বাধীনতালাভের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। যাহারা আমার রাজনৈতিক মতে বিশ্বাসী তাহারা যদি এই গৃহে আসে এবং এই গৃহের কোন অংশ যদি ওয়াফদ দলের সভার জন্য পৃথক করিয়া রাখি তাহা হইলে সেই কার্য্য হইতে আমাকে বিরত রাখার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের কতকটা সম্মতি আছে তাহাও আমি জানি না। কিন্তু ন্যায় অন্যায়ের তর্ক আপনার সহিত করা বৃথা, কারণ আপনার একমাত্র যুক্তি হইতেছে নিছক বলপ্রয়োগ।

সুতরাং আমারও একমাত্র উত্তর এই যে, আমি আপনার পরোয়ানার প্রতিবাদ করিতেছি। আপনার আদেশ আমার অধিকারের হানিকারক, সুতরাং আমি আপনার আদেশ মান্য করিব না। আপনি যদি বলপ্রয়োগের জন্যই পীড়াপীড়ি করেন তাহা হইলে বৃটিশ বাহিনীকে আমার স্বামী যে উত্তর দিয়াছিলেন আমিও সেই উত্তর দিতেছি—আমি একজন ওয়াফদ, আমি এবং ওয়াফদরা এই গৃহে থাকিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব, আমাদের উপর অন্যায় বল, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে যাহা করিতে পারে করুক।”

সমাপ্ত